মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাঘ-ফাল্গুন ১৪৩২
শাবান-রমাদান ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৫

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩
দারসুল কুরআন ॥ ৫
দারসুল হাদীস
রোগীর পরিচর্যা ঃ ইসলামের নির্দেশিকা ॥ ১৩
চিন্তাধারা
রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সৈনিকরা, শহীদরা এবং আমরা
আবুল আসাদ ॥ ২২
আধুনিক গণতন্ত্র ও ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা ঃ একটি তুলনা
ড. আহমদ আলী ॥ ৩১
রমযান গুনাহ মাফের মাস: মুমিনের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪০
আন্তর্জাতিক
থাইল্যাণ্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত
মীযানুল করিম ॥ ৪৭
প্রশ্নোত্তর ॥ ৫৩
বিআইসি বিজ্ঞাপন ॥ ৬১
বই পরিচিতি
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ॥ ৬৩

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫
সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

মাতৃভাষা মহান আল্লাহর এক অপার দান

ভাষা মহান আল্লাহ প্রদত্ত এক বিরাট নি'য়ামত। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য আল্লাহ এই ভাষা দান করেছেন। আল্লাহ বলেন, "করুণাময় (আল্লাহ) যিনি আল কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে সৃষ্টি করে ভাষা শিখিয়েছেন।" (৫৫ সূরা আর রহমান : ১-৪) মনের ভাব প্রকাশের বাহন হলো ভাষা। মায়ের ভাষায় কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই মাতৃভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করতেই মানুষ সবচেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

মাতৃভাষা প্রতিটি মানুষের জন্য মহান আল্লাহর এক অপার দান। বই পড়ে কিংবা শিক্ষকের কাছে গিয়ে এ ভাষা শিখতে হয় না। কোন প্রকার অক্ষর জ্ঞান ছাড়াই মহান আল্লাহ এটি মানব শিশুকে শিখিয়ে দেন। ফলে বর্ণমালার জ্ঞান ছাড়াই সে তার মনের সব কথা বলতে পারে। মাতৃভাষা বলা যেমন সহজ, অনুরূপভাবে তা অন্যের নিকট শুনে বোঝা বা উপলব্ধি করাও সহজ। এজন্য মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলগণকে স্বজাতির ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেন, "আমরা যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাকে তার স্বজাতির ভাষা দিয়েই প্রেরণ করেছি। যাতে তিনি তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারেন।" (১৪, সূরা ইব্রাহীম : ৪)

পূর্ববর্তী রাসূলগণের নিকট তাঁদের স্বজাতির ভাষায় কিতাব নাজিল করা হয়েছিল। আমাদের নবী আরবীয় ছিলেন এবং তাঁর ও তাঁর জাতির ভাষা ছিল আরবি। সেজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতি যে কিতাব নাযিল করেছেন, তা আরবি ভাষায় নাযিল করেছেন। কিতাবের প্রচার, ব্যাখ্যা, বিধি-বিধান বর্ণনা সবকিছুই তিনি তাঁর স্বজাতির ভাষা আরবীতেই করেছেন।

কুরআনে মহান আল্লাহ মানুষের জন্য যে সকল বিধি-বিধান প্রদান করেছেন সেগুলো জানতে, বুঝতে ও প্রচার করতে মাতৃভাষার সহযোগিতা নিয়ে করাই স্বাভাবিক এবং অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। এ ভাষায় ইসলামের বিধানসমূহকে জানা, বুঝা ও প্রচার করা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব। আরবী ভাষা না জানা এক্ষেত্রে আমাদের জন্য অজুহাত হতে পারে না। বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে যাঁরা আরবী ভাষা বুঝেন, এক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব অনেক বেশি। নিজের মাতৃভাষায় লোকদেরকে ইসলামের মর্মবাণী বুঝতে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করা তাঁদের ঈমানী দায়িত্ব।

এজন্য বাংলা ভাষায় বক্তৃতা, লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামের প্রচার করা একান্তই জরুরী। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে কোন কিছু বোঝাতে চাইলে যে ভাষা তারা বোঝে সে ভাষাতেই বোঝাতে হবে। যে ভাষা তারা বুঝে না সে ভাষায় বক্তৃতা দিলে বা লিখলে তারা কিছুই বুঝতে পারবে না। ফলে বুঝানোর যে উদ্দেশ্য তা সফল হবে না। আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মসজিদের জুমার খোৎবায় খতিবগণ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা আরবীতে দেওয়ার কারণে শ্রোতাগণ বুঝতে সক্ষম হন না। অথচ এ খোৎবা যদি প্রয়োজনীয় আরবি অংশসহ বাংলায় দেওয়া হতো তাহলে সকলেই তা বুঝতে ও উপলব্ধি করতে পারত। বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নিজ জাতির ভাষায় খোৎবা দেওয়া হলেও আমাদের দেশে সেটি করা হয় না। ফলে খোৎবার গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ বাণী থেকে সাধারণ জনগণ বঞ্চিত থাকছেন। এজন্য জুমু'আর খোৎবাসহ সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রচার করা একান্তই জরুরী। খতিব, ইমাম ও ওয়ায়িজগণ এ বিষয়টি গুরুত্বসহ উপলব্ধি করলে জাতি প্রভূত কল্যাণ অর্জনের সুযোগ পাবে।

সুখের বিষয়, বর্তমানে বাংলা ভাষায় ইসলামের বিধান প্রচার ও প্রসারে অনেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও পত্র-পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আবার অনেক সম্মানিত খতিবও জুমু'আর খোৎবা বাংলা ভাষায় দিচ্ছেন। কিন্তু তা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাভাষায় প্রকাশিত গবেষণাধর্মী ইসলামী পত্রিকা **'মাসিক পৃথিবী'**ও এক্ষেত্রে সাধ্যমত ভূমিকা রেখে চলেছে। ভাষার এই মাসে তাই আমাদের উদাত্ত আহ্বান, আসুন, সকলেই যার যার অবস্থানে থেকে বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করি। আর তার অংশ হিসেবে মাসিক 'পৃথিবী' নিজে পড়ি এবং অন্যকে পড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করি। ■

ইসলামি গবেষণা পত্রিকা

মাসিক 'পৃথিবী' নিজে পড়ুন

অন্যকে পড়তে উৎসাহিত করুন

সূরা আল হাদীদ : ২০-২১

اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ .

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ .

اَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوٰلِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ - سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ؕ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

ভাবানুবাদ

২০. 'জেনে নাও, দুনিয়ার এই জীবন খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব, সন্তান-সন্ততি এবং অর্থ-সম্পদে একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়।

এর উপমা হচ্ছে : বৃষ্টি হয়ে গেলো, গজিয়ে ওঠা গাছগুলো দেখে কৃষক উৎফুল্ল হয়ে ওঠলো, অতপর ফসল পেকে চোখ জুড়ানো সোনালী রঙ ধারণ করলো এবং শেষে দেখা গেলো তা ভূষিতে পরিণত হয়ে গেছে। আখিরাত এমন স্থান যেখানে একদিকে রয়েছে কঠিন আযাব, অন্যদিকে আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি। আর পৃথিবীর জীবন ছলনার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।

২১. একে অপরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাসী লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ এমন এক অনুগ্রহ যা আল্লাহ যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।'

৩। পরিপ্রেক্ষিত

এই সূরাটি হিজরী ৬ষ্ঠ সনে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক হুদাইবিয়ার সন্ধির পূর্ববর্তী কোন এক সময়ে নাযিল হয়।

বদর যুদ্ধের পরাজয়, উহুদ যুদ্ধে জয় লাভ করেও আলমাদীনা মুনাওয়ারাকে তছনছ করতে না পারার আক্ষেপ এবং আল আহযাব যুদ্ধে ২৫ দিন আলমাদীনাকে অবরুদ্ধ করে রাখার পর প্রচণ্ড শীত ও ধুলিঝড়ে কাবু হয়ে লজ্জাজনক পিছুহটা মাক্কার মুশরিকদেরকে ভীষণভাবে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিলো।

তারা গোটা আরব উপদ্বীপের মুশরিকদের সাথে যোগাযোগ করে মুমিনদের জন্য অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে তৎপর ছিলো। কোন দিকে যাওয়া-আসা মুমিনদের জন্য মোটেই নিরাপদ ছিলো না। বলা চলে, অর্থনৈতিকভাবেও তখন মুমিনগণ অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিলেন।

এই অবস্থাতেও মুমিনদেরকে অধিকতর দৃঢ়তা অবলম্বন এবং অধিকতর আর্থিক কুরবানীর তাকিদ দিয়ে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন নাযিল করেন সূরা আলহাদীদ।

❐ এই সূরার শুরুতে নিজের পরিচয় তুলে ধরে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন, 'তিনি আল আযীয, আল হাকীম, আল কাদীর, আল আউয়াল, আল আখির, আয্ যাহির, আল বাতিন এবং আল 'আলিম। আসমান ও পৃথিবীর সবকিছু তাঁরই কর্তৃত্বাধীন। আর জীবন মৃত্যুর চাবিকাঠিও তাঁরই হাতে।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ-র গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করেছেন। বিজয়ের পূর্বে অর্থ-সম্পদ দান করা যে বিজয়ের পরে দান করার চেয়ে অধিকতর মর্যাদাপূর্ণ তা ব্যক্ত করেছেন।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাঁর পথে অর্থ দানকে তাঁকে করযে হাসানা দেওয়া বলে উল্লেখ করেছেন এবং তা তিনি বহু গুণে বাড়িয়ে ফেরত দেবেন বলে জানিয়েছেন।

আল্লাহর পথে যাঁরা অকাতরে অর্থ-সম্পদ দান করেন তাঁদেরকে তিনি নূর দান করবেন যেই নূর আখিরাতে তাদের চলার পথ আলোকোজ্জ্বল করে রাখবে।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন যেই সব আহলি কিতাব দুনিয়া পূজায় লিপ্ত হয়েছে বিধায় তাদের মন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেছে, মুমিনগণ যেনো তাদের মতো হয়ে না যান, সেই মর্মে তাঁদেরকে সাবধান করেছেন।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার জীবনের স্বল্প পরিসর স্থায়িত্ব এবং এর সম্পদ-সম্ভারের নগণ্যতার কথা মুমিনদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন মুমিনদেরকে আবারো স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে মানুষের উচিত জান্নাত প্রাপ্তির জন্য প্রতিযোগিতা করা।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আবারো জানালেন যে আল্লাহর অনুমোদন ছাড়া কারো ওপর বিপদ-মুছীবাত আসতে পারে না। আর মুমিনদের ওপর বিপদ-মুছীবাত আপতিত হয় তাদের প্রশিক্ষণ ও মানোন্নয়নের জন্য।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন জানালেন যে নবী-রাসূলদেরকে এমন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে যা প্রবর্তিত হলে প্রতিটি মানুষ তার ন্যায্য অধিকার পেয়ে ধন্য হবে।

❐ এই সূরাতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আরো জানালেন যে যাঁরা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রতি ঈমান এনে আল্লাহকে ভয় করে চলবেন, তিনি তাঁদেরকে এমন নূর (দূর দৃষ্টি) দান করবেন, যা তাঁদেরকে দুনিয়ার বাঁকাপথগুলো পরিহার করে সত্য-সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে।

৪। ব্যাখ্যা

২০ নাম্বার আয়াত

ٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى ٱلْأَمْوَٰلِ وَٱلْأَوْلَٰدِ ۖ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَىٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَٰمًا ۖ وَفِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَٰنٌ ۚ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلْغُرُورِ

'জেনে নাও, দুনিয়ার এই জীবন একটি খেলা, হাসি-তামাশা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গর্ব, সন্তান-সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে একে অপরকে অতিক্রম করে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে : বৃষ্টি হয়ে গেলো, গজিয়ে ওঠা গাছগুলো দেখে কৃষক উৎফুল্ল হয়ে ওঠলো, অতপর ফসল পেকে চোখ জুড়ানো সোনালী রঙ ধারণ করলো এবং পরে দেখা গেলো তা ভূষিতে পরিণত হয়ে গেছে। আখিরাত এমন স্থান যেখানে একদিকে রয়েছে কঠিন আযাব, অন্যদিকে রয়েছে আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি। আর পৃথিবীর জীবন তো ছলনার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

❐ পৃথিবীর সম্পদ ও উপকরণের তুচ্ছতা সম্পর্কে সূরা আশ্-শূরা-র ৩৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

فَمَا أُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

'তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা দুনিয়ার (ক্ষণস্থায়ী) জীবনের সামান্য সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর কাছে যা আছে তা যেমনি উত্তম তেমনি স্থায়ী। তা সেইসব লোকদের জন্য– যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে।'

❐ সূরা আল 'আন্কাবূত-এর ৬৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ ط وَاِنَّ الدَّارَ الاٰخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ ج لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ○

'আর দুনিয়ার জীবন হাসি-তামাশা, খেলা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর আখিরাতের ঘর– সেটাই তো জীবন– যদি ওরা জানতো।'

❐ সূরা আল কাহ্ফ-এর ৪৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلاً ○

'এই অর্থ-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুনিয়ার জীবনের সাময়িক সাজসজ্জামাত্র।

আসলে তো টিকে থাকার মতো নেক আমলই তোমার রবের নিকট পরিণামের দিক দিয়ে উত্তম এবং এই বিষয়েই ভালো কিছু আশা করা যায়।

❐ সূরা আলে ইমরানের ১৪ ও ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ط ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَاللّٰهُ عِنْدَه حُسْنُ الْمَاٰبِ ○ قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ط لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَ اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌ م بِالْعِبَادِ.

'মানুষের জন্য আকর্ষণীয় জিনিস, যেমন, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, সোনা-রূপার স্তূপ, চিহ্নিত ঘোড়া (অর্থাৎ সেরা ঘোড়া), গৃহপালিত পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি ভালোবাসাকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এইগুলো দুনিয়ার জীবনের তুচ্ছ সামগ্রী মাত্র। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম আবাস।

বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো এইগুলোর চেয়ে উত্তম জিনিসের কথা? যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবহমান, যেখানে তারা থাকবে চিরদিন, পাবে পবিত্রা স্ত্রী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সব কিছু দেখে থাকেন।'

❐ কাফিরগণ এই নগণ্য দুনিয়ার মজা লুটার কাজেই মত্ত থাকে। সূরা মুহাম্মাদ-এর ১২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ.

'আর কাফিররা দুনিয়ার মজা লুটছে, জন্তু-জানোয়ারের মতো পানাহার করছে। জাহান্নামই ওদের চূড়ান্ত ঠিকানা।'

❐ দুনিয়া পূজারীদের জাঁকজমকপূর্ণ জীবন ধারার দিকে চোখ তুলে তাকাতে নিষেধ করে সূরা তা-হা-র ১৩১ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِه اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لا لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ ط وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى .

'দুনিয়ার জীবনের এই জাঁকজমক যা আমি তাদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে দিয়েছি, সেইগুলোর দিকে তুমি চোখ তুলে তাকাবে না। এই সব তো তাদেরকে পরীক্ষায় ফেলার জন্য আমি দিয়েছি। আর তোমার রবের (নিকট মওজুদ) রিযকই উত্তম এবং স্থায়ী।'

❐ দুনিয়ার পেছনে ছুটা যে মরীচিকার পেছনে ছুটার মতো নিষ্ফল তা বুঝাতে গিয়ে সূরা আন্ নূর-এর ৩৯ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ م بِقِيْعَةٍ يَّحْسَبُهُ الظَّمْاٰنُ مَاءً ط حَتّٰى اِذَا جَاءَه لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَّ وَجَدَ اللّٰهَ عِنْدَه فَوَفّٰهُ حِسَابَه ط وَاللّٰهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

'যারা কুফর অবলম্বন করে তাদের আমলের উপমা হচ্ছে : মরুভূমিতে দৃষ্ট মরীচিকার মতো। পিপাসাকাতর মানুষ ওটাকে পানি মনে করে।
যখন সে সেখানে পৌঁছে তখন সে কিছুই পায় না। কিন্তু সে পায় আল্লাহকে যিনি তার পুরো হিসাব চুকিয়ে দেন। আর আল্লাহ হিসাব গ্রহণে খুবই ত্বরিৎ।'

❐ দুনিয়ার জীবনের মনোমুগ্ধকর উপকরণগুলো এইভাবেই শেষাবধি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়। সেই জন্যই আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার উপকরণগুলোকে 'ছলনার উপকরণ' বলে উল্লেখ করেছেন।

❐ তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আখিরাতের বাস্তব অবস্থার কথাও তুলে ধরেছেন। যারা তাদের জীবনোদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে 'ছলনার উপকরণ' গুলোর পেছনে ছুটে ছুটে জীবনাতিপাত করবে তাদের জন্য عَذَابٌ شَدِيْدٌ (কঠিন শাস্তি) অপেক্ষমান। পক্ষান্তরে যাঁরা তাঁদের জীবনোদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সংগ্রামে নিবেদিত থেকে জীবনাতিপাত করবেন, তাঁদের জন্য রয়েছে مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانٌ (আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি)।

২১ নাম্বার আয়াত

سَابِقُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَرُسُلِه ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ○

'একে অপরকে অতিক্রম করে এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি বিশ্বাসী লোকদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। এ এমন এক অনুগ্রহ যা আল্লাহ যাকে চান, দান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।'

❐ আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের মাগফিরাত এবং জান্নাতকে লক্ষ্য বস্তু বানিয়ে জীবন যাপনের তাকিদ দিয়ে সূরা আলে ইমরান-এর ১৩৩ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

سَارِعُوْآ اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ ○

'দ্রুত এগিয়ে চল তোমাদের রবের মাগফিরাত ও জান্নাতের দিকে যার– বিস্তৃতি আসমান ও পৃথিবীর বিস্তৃতির মতো, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে।'

❐ জান্নাতে মুত্তাকীদের জন্য যেই সব নি'মাত মওজুদ করে রাখা হয়েছে তার বর্ণনা দিয়ে সূরা মুহাম্মাদ-এর ১৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ط فِيْهَآ اَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُه ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِيْنَ ج وَاَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ط

'মুত্তাকীদের জন্য যেই জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার স্বরূপ হচ্ছে : এতে রয়েছে স্বচ্ছ পানির ঝর্ণা যা কখনো দূষিত হয় না, এতে রয়েছে দুধের ঝর্ণা যার স্বাদ কখনো নষ্ট

হয় না, এতে রয়েছে শারাবের ঝর্ণা যা পানকারীদেরকে তৃপ্তি দেয়, এতে রয়েছে স্বচ্ছ ও নির্মল মধুর ঝর্ণা। এতে রয়েছে সব রকমের ফল। আর তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের মাগফিরাত।'

❐ সূরা আল মুতাফ্ফিফীন-এর ২২ থেকে ২৬ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ○ عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُوْنَ ○ تَعْرِفُ فِىْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيْمِ ○ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ○ خِتَمُه مِسْكٌ ط وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ○

'নিশ্চয়ই পুণ্যবান ব্যক্তিরা পরম আনন্দে থাকবে। তারা উচ্চাসনে বসে নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবে। তুমি তাদের চেহারায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ ভোগের ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাবে। তাদেরকে সিল আঁটা পানীয় পান করানো হবে যা মিসকের সুঘ্রাণযুক্ত। প্রতিযোগিতা করে যারা জিততে চায় তাদের তো এই ক্ষেত্রে জেতার জন্যই প্রতিযোগিতা করা উচিত।'

❐ সূরা আদ্ দাহ্র-এর ১৩ থেকে ২০ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

مُتَّكِئِيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَائِكِ ج لَايَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ○ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلاً ○ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ○ قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ○ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلاً ○ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلاً ○ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ج اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ○ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ○

'তারা উচ্চাসনে হেলান দিয়ে বসবে। সেখানে তারা সূর্যের প্রখর উত্তাপও দেখবে না, শীতের তীব্রতাও দেখবে না। গাছের ছায়া ঝুঁকে থাকবে তাদের ওপর। ফল ভরা শাখাগুলো থাকবে তাদের নাগালের মধ্যে। পানীয় ভর্তি রূপা ও কাঁচের পাত্র হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই কাঁচ পাত্রও হবে রূপাজাতীয়। আর এইগুলো সঠিক পরিমাণে ভর্তি থাকবে। সেখানে তাদেরকে পেয়ালা ভর্তি এমন পানীয় পান করানো হবে যাতে আদার নির্যাস মেশানো থাকবে। সেখানে থাকবে একটি ঝর্ণা যার নাম সালসাবীল। তাদের সেবায় নিয়োজিত থাকবে একদল বালক যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তাদেরকে দেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মুক্তা বলে মনে হবে। তুমি যেই দিকেই তাকাবে নি'মাত আর নি'মাতই দেখতে পাবে। আর দেখতে পাবে বিশাল সাম্রাজ্য।'

❐ সূরা আল কামার-এর ৫৪ ও ৫৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنَّاتٍ وَّنَهَرٍ ○ فِىْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ ○

'নিশ্চয়ই মুত্তাকী লোকেরা বাগান ও ঝর্ণার মধ্যে থাকবে। সত্যিকার সম্মানের স্থানে, মহাশক্তিধর সম্রাটের নিকটে।'

❐ একটি হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন বলেন,

اَعْدَدْتُ لِعِبَادِىَ الصَّالِحِيْنَ مَالاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلى قَلْبِ بَشَرٍ ○

'আমি আমার ছালিহ বান্দাদের জন্য এমন সব নি'মাত মওজুদ করে রেখেছি যা কোন চোখ কখনো দেখেনি, যার কথা কোন কান কখনো শুনেনি এবং যার ধারণা কোন হৃদয়ে কখনো উদিত হয়নি।'

সন্দেহ নেই, জান্নাতে একটু ঠাঁই পাওয়া মানুষের বড়ো পাওয়া, পরম পাওয়া।

এই পাওয়া আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের অনুগ্রহ নির্ভর। এমন অনুগ্রহ করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনেরই রয়েছে। তবে আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন অপাত্রে তাঁর অনুগ্রহ দান করেন না।

শিক্ষা

১. হারাম থেকে বেঁচে, হালালের গণ্ডিতে থেকে, কারো কাছে হাত না পেতে এবং ঋণগ্রস্ত না হয়ে জীবন যাপন করতে পারার মতো অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া অভিপ্রেত।

প্রয়োজন পূরণের মতো অর্থ-সম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অবিরাম অর্থ-সম্পদের পেছনে দৌড়ানো অভিপ্রেত নয়।

এক শ্রেণীর লোক অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়া, বহুসংখ্যক বাড়ি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক হওয়া এবং রকমারি বিলাস সামগ্রী সংগ্রহ করার কাজে অহর্নিশ মেতে থাকে। এটারই নাম দুনিয়া-প্রীতি।

দুনিয়া-প্রীতি আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকে বাধাগ্রস্ত করে তোলে। সেই জন্য আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা মানুষকে বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ দুনিয়ার জীবনের গোলক ধাঁধাঁয় পড়ে প্রতারণার শিকারে পরিণত না হয়। অতএব কোন অবস্থাতেই দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত অবস্থা আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয়।

২. দুনিয়ার স্বল্প পরিসর জীবন শেষে মৃত্যুর দুয়ার পথে আমাদেরকে আখিরাতের অনন্ত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতেই হয়। আখিরাতে একদিকে রয়েছে জাহান্নাম, অপরদিকে জান্নাত। জাহান্নাম চরম শাস্তি, কষ্ট-যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা ভোগের স্থান। জান্নাত পরম সুখ-শান্তি, আরাম-আনন্দ উপভোগের স্থান।

জান্নাত এক মহা-সাম্রাজ্য।

একেবারেই কম মর্যাদাবান একজন জান্নাতীকে জান্নাতের যতোটুকু স্থান দেওয়া হবে, তা বর্তমান পৃথিবীর দশগুণ বড়ো।

জান্নাতের নি'মাতগুলো অনুপম সৌন্দর্যমণ্ডিত। জান্নাতের নি'মাতগুলো অতুলনীয় সুঘ্রাণযুক্ত। জান্নাতের খাদ্য ও পানীয় অতীব সুস্বাদু।

জান্নাতে অভাব নেই। জান্নাতে অতৃপ্তি নেই। জান্নাতে অশান্তি নেই। জান্নাতে অসুখ নেই। জান্নাতে বার্ধক্য নেই। জান্নাতে মৃত্যু নেই।

আর এই জান্নাত কখনো হাতছাড়া হবে না।

অতএব এই জান্নাত প্রাপ্তির লক্ষ্যেই আমাদের সকল চেষ্টা-সাধনা নিয়োজিত হওয়া উচিত।

অধ্যাপক এ. কে. এম. নাজির আহমদ

১২ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

রোগীর পরিচর্যা : ইসলামের নির্দেশিকা

عن عليٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

অনুবাদ

আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, "কোনো মুসলিম অপর কোনো মুসলিম (রোগী) কে সকাল বেলা দেখতে (পরিচর্যা করতে) গেলে সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। (অনুরূপভাবে) যদি সে সন্ধ্যা বেলা তাকে দেখতে যায় তবে ভোর পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য দু'আ করতে থাকে। অবশেষে তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুরের বাগান নির্ধারিত হয়ে যায়"।[১]

ব্যাখ্যা

মানবজীবনে অভাব-অনটন, রোগ-ব্যাধি, দুঃখ-কষ্ট লেগেই থাকে এবং এর মধ্য দিয়েই মানুষের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। এতদসত্ত্বেও মানুষকে এমন কিছু সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, যা উপেক্ষা করার সুযোগ থাকে না। এসব দায়িত্বের অন্যতম হচ্ছে রোগীর পরিচর্যা। রোগীর পরিচর্যায় যেমন বিপুল সাওয়াবের সুসংবাদ রয়েছে তদ্রূপ অবহেলায় রয়েছে কঠোর সতর্কবাণী। অত্র হাদীসে রোগীর পরিচর্যায় ব্যাপক সাওয়াবের বিষয় বিবৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীসে 'রোগ' বোঝাতে মারাদুন (**مرض**) এবং রোগী বোঝাতে 'মারীদুন' (**مريض**) শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এই 'রোগ' দ্বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- একটি মনের অভ্যন্তরের রোগ (শিরক-কুফ্‌র,বিদ'আত ও অশ্লীলতা ইত্যাদি) অর্থে এবং অপরটি শারীরিক অসুস্থতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য দারসুল হাদীসে আমরা রোগ বলতে শারীরিক অসুস্থতা বোঝাবো এবং আমরা অত্র

১. তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, বাব: মা জাআ ফী ই'আদাতিল মারিদ, নং ৯৮৫, হাদীসটি হাসান।

দারসুল হাদীসের আলোচনায় রোগীর পরিচর্যার গুরুত্বের বিষয় আলোচনায় প্রবৃত্ত হবো। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .

" এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগমুক্ত করেন" ।[২]

মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে মানুষকে বিভিন্নভাবে পরীক্ষা করেন। তাতে ধৈর্য ধারণে রয়েছে সুসংবাদ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ .

"এবং আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো ভয়-ভীতি, দুর্ভিক্ষ এবং জীবন, সম্পদ ও ফল-ফসলের ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে। তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দাও" ।[৩]

কখনো কখনো আমরা অসুস্থ হলে লোকজনের নিকট বলাবলি করি। এই বলা যদি অভিযোগের সুরে না হয়ে একান্তভাবে দু'আর জন্য হয়, তবে তা দূষণীয় নয়। নবী-রাসূলগণ অসুস্থ হলে মহান আল্লাহর নিকট নিরাময়ের জন্য দু'আ করতেন। যেমন-

وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ – فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ ...

"এবং আইয়ুব, যখন সে তার প্রতিপালককে ডেকেছিলো (এই বলে যে), দুঃখ-কষ্ট আমাকে স্পর্শ করেছে। আর তুমি তো দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। সুতরাং আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার যে দুঃখ-দুর্দশা ছিলো তা দূর করলাম"... ।[৪]

উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানবজীবন পিদসংকুল হবে। তবে এর জন্য যেমন মহান আল্লাহর কাছে দু'আর অপরিহার্যতা রয়েছে তদ্রূপ অপরাপর মানুষের রোগীর সেবা করার বিষয়টি নিহিত রয়েছে।

মানবজীবনে রোগ-ব্যাধি ও তাতে সবর

মানবজীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ। তাই বিপদ-আপদ ও রোগ-ব্যাধি লেগেই থাকে। এভাবে জীবনের পরসমাপ্তি ঘটে।

মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ.

"হে মানুষ! তুমি তোমার রবের নিকট পৌঁছা পর্যন্ত কঠোর সাধনা করে থাকো,পরে তুমি তাঁর সাক্ষাত লাভ করো" ।[৫]

আমাদের মনে রাখতে হবে, রোগ-ব্যাধির মাধ্যমে পাপরাশি ঝরে যায়। সুরতাং তা কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে, অধৈর্য হওয়া যাবে না। এবিষয়ে হাদীসে বিশেষ নির্দেশনা

---

২. ২৬-সূরা আশ-শু'আরা : ৮০
৩. ২-সূরা আল-বাকারা : ১৫৫
৪. ২১-সূরা আল-আম্বিয়া : ৮৩-৮৪
৫. ৮৪-সূরা আল-ইনশিকাক : ৬

রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – « مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন"।[৬]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ –ﷺ– وَهُوَ يُوعَكُ فَمَسِسْتُهُ بِيَدِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « أَجَلْ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ ». قَالَ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « أَجَلْ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلاَّ حَطَّ اللَّهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا.

'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সা) এর নিকট গেলাম। তখন তিনি ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। আমি তাঁর দেহ হাত দ্বারা স্পর্শ করে বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তো ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, হাঁ; আমি এমনভাবে জ্বরে আক্রান্ত যেমন তোমাদের দুজনের হয়ে থাকে। রাবী বলেন, আমি বললাম: এ কারণেই আপনার জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, কোনো মুসলিমের ওপর জ্বর কিংবা অন্য কোনো ধরনের বিপদ আপতিত হলে তার প্রতিদান স্বরূপ মহান আল্লাহ তার পাপরাশি এমনভাবে মুছে দেন যেভাবে গাছপালা তার পাতা ঝরায়"।[৭]

অপর এক হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَتَى نَبِىُّ اللَّهِ –ﷺ– عَلَى امْرَأَةٍ تَبْكِى عَلَى صَبِىٍّ لَهَا فَقَالَ لَهَا « اتَّقِى اللَّهَ وَاصْبِرِى ». فَقَالَتْ وَمَا تُبَالِى أَنْتَ بِمُصِيبَتِى فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِىُّ –ﷺ–. فَأَتَتْهُ فَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابِهِ بَوَّابِينَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَعْرِفْكَ فَقَالَ « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى ». أَوْ « عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলা নবী (সা) এর নিকট এলো। সে তার ছেলের মৃত্যুশোকে কাঁদছিলো। তিনি তাকে বলেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্যধারণ করো। মহিলাটি বললো, তুমি আমার মতো বিপদে পড়োনি তো! তাকে বলা হলো: ইনি নবী (সা)। অতঃপর সে তাঁর বাড়িতে এলো কিন্তু দরজায় কোনো দারোয়ান পেলো না। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। তখন তিনি বলেন, প্রকৃত ধৈর্য হচ্ছে বিপদের শুরুতে অথবা প্রথম কষ্টেই"।[৮]

---

৬. বুখারী, কিতাবুত তিব্ব ওয়াল মারদা, বাব: মা জাআ ফী কাফ্ফারাতিল মারাদ, নং ৫৬৪৫

৭. মুসলিম, কিতাবুল জানায়িয, বাব: সাওয়াবুল মুমিনি ফীমা ইয়াসীবুহু মিম-মারাদিন...., নং ৬৭২৪

৮. আবূ দাউদ, কিতাবুল জানায়িয, বাব: আস-সাবরু ইনদাল মুসীবাহ, নং ৩১২৬

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – قَالَ « مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেছেন, "মুসলিম ব্যক্তি দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, নির্যতন, দুশ্চিন্তার শিকার হলে এমনকি তার শরীরে কাঁটা বিদ্ধ হলে (এবং তাতে সে সবর করলে) আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন"।[৯]

عن جابر ﷺ قال : دَخل النبي ﷺ على أُمِّ السَّائِبِ وهِي تُزَفزِف. فقال : مَالَكِ ؟ قالت : الحُمَّى أَخزَاهَا الله . فقال النبي ﷺ : مَه لا تَسبِّيهَا فَإِنَّهَا تُذهِبُ خَطايَا المُؤمنِ ، كَما يُذهِبُ الكِيرُ خَبثَ الحَديد.

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সা) উম্মুস সায়িব (রা)–এর বাড়িতে যান। তিনি তখন জ্বরের প্রকোপে কাঁদছিলেন। তিনি বলেন, তোমার কী হয়েছে? সে বললো, জ্বর। আল্লাহ জ্বরের সর্বনাশ করুন। নবী (সা) বলেন, থামো; জ্বরকে গালি দিও না। কেননা তা মুমিন বান্দার গুনাহসমূহ দূর করে দেয়, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে দেয়"।[১০] বিপদে পড়ে মৃত্যু কামনা করা সমীচীন নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এর মাঝেও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। যেমন হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ أَنَسٍ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ – « لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ أَحْيِنِى مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِى ، وَتَوَفَّنِى إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِى .

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) বলেন, "তোমাদের কেউ বিপদে পড়ে যেনো মৃত্যু কামনা না করে। যদি তা করতেই হয় তাহলে তার বলা উচিত : 'হে আল্লাহ! আমাকে জীবিত রাখো যতদিন বেঁচে থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হয়। আর আমাকে মৃত্যু দিও, যখন সেই মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হয়"।[১১]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রোগ-ব্যাধি ও বিপদ-আপদ থাকবে। তবে তাতে অধৈর্য না হয়ে ধৈর্য ধারণের জন্য মহান আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে।

---

৯. বুখারী, কিতাবুল মারদা ওয়াত-তিব্ব, বাব: মা জাআ ফী কাফ্ফারাতিল মারাদ, নং ৫৬৪১

১০. আল-আদাবুল মুফরাদ, ই'আদাতুল মারদি, নং ৫১৬

১১. বুখারী, কিতাবুল মারদা, বাব: শিদ্দাতুল মারাদ, নং ৫৬৭১

রোগীর সেবা করা অপরিহার্য

রোগীর সেবা করা ইসলামী জীবনদর্শনের অন্যতম অনুষঙ্গ। এর মাধ্যমে মানুষের মানবিকতা ফুটে ওঠে। এতে কেবল বিপুল সাওয়াব রয়েছে বিষয়টি তাই নয়, বরং রোগীর সেবা করার ব্যাপারে রয়েছে মহানবী (সা) এর নির্দেশ। এবিষয়ে হাদীসে নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ أَطْعِمُوا الْجَائِعَ ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ .

আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা ক্ষুধার্তকে আহার করাও, রোগীর সেবা করো এবং বন্দী মুক্তি করো"।[১২]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُودُوا الْمَرِيضَ وَاتَّبِعُوا الْجَنَازَةَ تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা রোগীর পরিচর্যা করো এবং জানাযার অনুসরণ করো। তা তোমাদেরকে আখিরাত স্মরণ করিয়ে দিবে"।[১৩]

বিপদগ্রস্ত মানুষকে সেবা না করলে কিয়ামতের দিন জবাবদিহির আওতায় আনা হবে। এবিষয়ে হাদীসে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ أَبِي هريرة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – ﷺ إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قالَ: يا رَبِّ، وكيفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِي فُلانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لوْ أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِي، يا ابْنَ آدَمَ، اسْتَسْقَيْتُكَ، فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟! قالَ: اسْتَسْقاكَ عَبْدِي فُلانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أمَا إنَّكَ لو سَقَيْتَهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِي.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বলবেন: "হে বনী আদম! আমি অসুস্থ ছিলাম, কিন্তু তুমি আমার পরিচর্যা করোনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমার পরিচর্যা করবো, তুমি তো বিশ্ব জাহানের রব? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ হয়েছিলো, কিন্তু তুমি তার পরিচর্যা করোনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তার পরিচর্যা করতে আমাকে তুমি তার কাছে পেতে।

---

১২. বুখারী, কিতাবুল মারদা, বাব: উজুবু ইয়াদাতিল মারীদ, নং ৫৬৪৯

১৩. মুসনাদ আহমাদ, নং ১১৫৭৪

হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে আহার করাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমাকে আহার করবো, তুমি তো বিশ্ব জাহানের রব? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খাবার চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে আহার করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে আহার করাতে তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে।

হে বনী আদম! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার রব! আমি কীভাবে তোমাকে পানি পান করাবো, তুমি তো বিশ্ব জাহানের রব? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিলো, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে তাহলে তুমি আমাকে তার কাছে পেতে"।[১৪]

উপরোক্ত হাদীসগুলো থেকে রোগীর সেবা করার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয়। উল্লেখ্য, এই সেবা হবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবার জন্য অবারিত। মহানবী (সা) এর জীবনে মুসলিম-অমুসরিশ নির্বিশেষে সবার সেবা করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

রোগীর পরিচর্যার ফযীলত

রোগীর সেবায় বিশেষ ফযীলত রয়েছে। হাদীসে এবিষয়ে ব্যাপক নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ « مَنْ عَادَ مَرِيضًا لَمْ يَزَلْ فِى خُرْفَةِ الْجَنَّةِ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا خُرْفَةُ الْجَنَّةِ قَالَ « جَنَاهَا.

রাসূলুল্লাহ (সা) এর মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো রোগীর সেবা করবে, সে 'খুরফাতুল জান্নাতে' অবস্থান করবে। বলা হলো : হে আল্লাহর রাসূল! খুরফাতুল জান্নাত কী? তিনি বলেন, জান্নাতের ফলমূল কুড়ানো"।[১৫]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি কোনো রোগীকে দেখতে গেলে আকাশ থেকে একজন আহ্বানকারী ডেকে বলেন, তুমি উত্তম কাজ করেছ, তোমার পথচলা কল্যাণময় হোক এবং তুমি জান্নাতে একটি আবাস নির্ধারণ করে নিলো।[১৬]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِى الرَّحْمَةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ اغْتَمَسَ فِيهَا .

---

১৪. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব: ফাদলু ই'আদাতিল মারীদ, নং ৬৭২১

১৫. মুসলিম, প্রাগুক্ত, নং ৬৭১৯

১৬. ইবন মাজা, কিতাবুল জানায়িয, বাব: ফী সাওয়াবি মান 'আদা মারীদান, নং ১৫১০

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি কোনো অসুস্থ লোককে দেখতে রওয়ানা হলে সে মূলত আল্লাহর রহমতের সাগরে সাঁতার কাটতে থাকে,যতক্ষণে সে রোগীর কাছে না পৌঁছে। আর যখন সে রোগীর নিকট পৌঁছে, সে রহমতের সাগরে ডুব দেয়"।[১৭]

উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে রোগীর পরিচর্যার ফযীলত সহজেই অনুমান করা যায়।

রোগী পরিচর্যাকারীর করণীয়

যিনি রোগীর সেবা করতে যাবেন তাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সামনে রাখতে হবে-

(১) রোগীকে সান্ত্বনাদান

রোগী যত জটিল রোগের শিকার হোক তাকে হতাশ করা উচিত নয়, বরং তাকে সান্ত্বনা দেয়া উচিত। যেমন হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي الأَجَلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئًا وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ الْمَرِيضِ .

আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "তোমরা কোনো রোগীর কাছে গেলে তাকে সান্ত্বনা দিবে। এতে যদিও তার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু তার আত্মা প্রশান্তি লাভ করবে"।[১৮]

عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنِ النَّبِيِّ –ﷺ– أَنَّهُ قَالَ « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّى أَخَاهُ بِمُصِيبَةٍ إِلاَّ كَسَاهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ مِنْ حُلَلِ الْكَرَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আমর ইবন হাযম (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার মুমিন ভাইকে বিপদে সান্ত্বনা দিবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে সম্মানের পোশাক পরিধান করাবেন"।[১৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ – يَعُودُهُ – قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ – ﷺ – إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فَقَالَ لَهُ « لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » . قَالَ قُلْتَ طَهُورٌ كَلاَّ بَلْ هِىَ حُمَّى تَفُورُ – أَوْ تَثُورُ – عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ ، تُزِيرُهُ الْقُبُورَ . فَقَالَ النَّبِيُّ – ﷺ – « فَنَعَمْ إِذًا .

'ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। একদা নবী (স) এক বেদুইন রোগীকে দেখতে যান। রাবী বলেন, নবী (স)-এর অভ্যাস ছিলো, তিনি কোনো রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন: "দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ চাহেত তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। তিনি বেদুইনকে আরো বলেন, দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ চাহেত তুমি সুস্থ হয়ে যাবে। সে

---

১৭. মুসনাদ আহমাদ, নং ১৪৬৩১

১৮. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাব: মা জাআ ফী ইয়াদাতিল মারীদ, নং ১৫০৫

১৯. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাব: মা জাআ ফী সাওয়াবি মান আজ্জা মুসাবান, নং ১৬৬৯

বললো, আমি বললাম, সুস্থ? বিষয়টি তা নয়। তা তো জ্বর,যা এ বৃদ্ধের দেহে টগবগ করে ফুটছে এবং তা তাকে কবর দেখিয়ে ছাড়বে। নবী (স) বলেন, হাঁ,হয়ত তা-ই"।[২০]

(২) রোগীর চাহিদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা

মানুষ যখন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয় তখন তার কিছু পছন্দের খাবারের কথা মনে পড়ে। কাজেই সে কোনো কিছু খেতে চাইলে তার ব্যবস্থা করা উচিত। যেমন-

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- عَادَ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ « مَا تَشْتَهِى ». فَقَالَ أَشْتَهِى خُبْزَ بُرٍّ. فَقَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- « مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَثْ إِلَى أَخِيهِ ». ثُمَّ قَالَ النَّبِىُّ -ﷺ- « إِذَا اشْتَهَى مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا فَلْيُطْعِمْهُ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) এক রোগীকে দেখতে গিয়ে বলেন, "তুমি কি (খেতে) চাও? সে বললো, আমি গমের রুটি খেতে চাই। নবী (সা) বলেন, কারো কাছে গমের রুটি থাকলে সে যেনো তা তার ভাইয়ের নিকট পাঠায়। অতঃপর নবী (সা) বলেন, তোমাদের কারো রোগী কিছু খেতে চাইলে সে যেনো তাকে তা খাওয়ায়"।[২১]

(৩) রোগীর নিকট দীর্ঘ সময় বসে থাকা অনুচিত

রোগীর কাছে গিয়ে বসার গুরুত্ব রয়েছে কিন্তু তা যেনো তার বিরক্তির কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। হাদীসে এবিষয়ে নির্দেশনা পাওয়া যায়। যেমন-

عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ سُرْعَةُ الْقِيَامِ."

সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "রোগী সেবার উত্তম নিয়ম হলো,তার নিকট থেকে তাড়াতাড়ি উঠে যাওয়া"।[২২]

(৪) রোগীর নিকট দু'আ প্রার্থনা

কোনো ব্যক্তি যখন অসুস্থ থাকে তখন তার মন নরম থাকে। সেসময় সে আল্লাহর দিকে অধিক রুজু থাকে এবং তার দু'আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই তার নিকট দু'আ চাওয়া উচিত। হাদীসে উল্লেখ আছে-

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ لِى النَّبِىُّ -ﷺ- « إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ فَمُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ الْمَلاَئِكَةِ.

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (স) আমাকে বলেছেন, "তুমি কোনো রোগী দেখতে গেলে তার নিকট দু'আ করতে বলবে। কেননা তার দু'আ ফেরেশতাকুলের দু'আর সমতুল্য"।[২৩]

---

২০. বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, বাব: আলামাতুন-নাবী স. নং ৩৬১৬

২১. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাব: আল-মারীদু ইয়াশতায়িশ শাইউ, নং ১০০৬

২২. আল-বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান, নং ৮৭৮৫

২৩. ইবন মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাব: মা জাআ ফী ই'আদাতিল মারীদ, নং ১৫০৮

(৫) রোগীর সুস্থতার জন্য দু'আ

রোগীর নিকট গিয়ে দু'আ করা উচিত। এতে সে প্রশান্তি লাভ করবে। যেমন-

عَنْ عَائِشَةَ – رضى الله عنها – أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ « اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِى ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

"আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (স) সূরা আন-নাস ও সূরা আল-ফালাক পাঠ করে তাঁর কোনো একজন স্ত্রীর ব্যথার স্থানে ডান হাত বুলিয়ে দিতেন এবং এই দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! মানবজাতির রব, ব্যথা দূর করে দাও। তাকে আরোগ্য দান করো। তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্যদান ব্যতীত আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্যদান করো, যাতে রোগের নাম-নিশানা না থাকে"।[২৪]

শিক্ষা

(১) দুনিয়ার জীবন পরীক্ষার ক্ষেত্র

(২) মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের পরীক্ষা করেন

(৩) বিপদে অধৈর্য নয়, ধৈর্য কাম্য

(৪) রোগীর সেবা ঈমানী দায়িত্ব

(৫) রোগীর নিকট দু'আ চাওয়া

(৬) রোগীকে দু'আ করা এবং

(৭) দীর্ঘ সময় বসে থেকে রোগীর বিরক্তির উদ্রেক ঘটানো অনুচিত।

মহান আল্লাহ আমদেরকে আমৃত্যু সুস্থ রাখুন এবং কারো গলগ্রহ হওয়া থেকে হেফাযত করুন। পরিশেষে আমরা তাঁর দরবারে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করতে পারি-

اللَّهُمَّ عَافِنِى فِى جَسَدِى وَعَافِنِى فِى بَصَرِى وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنِّى لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

"হে আল্লাহ! আমাকে শারীরিক সুস্থতা দান করো,আমার দৃষ্টিশক্তি ভালো রাখো এবং আমাকে আমৃত্যু সুস্থ রাখো। আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি পরম সহনশীল ও অতীব দয়াবান। মহান আরশের মালিক আল্লাহ অতি পবিত্র। জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই যাবতীয় প্রশংসা"।[২৫] ■

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

২৪. বুখারী, কিতাবুত-তিব্ব, বাব: রুকইয়াতুন-নাবী স., নং ৫৭৪৩

২৫. তিরমিযী, আবওয়াবুত দাওয়াত, বাব: আল্লাহুম্মা 'আফিনী জাসাদী... নং ৩৮১৭

রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের সৈনিকরা, শহীদরা এবং আমরা

আবুল আসাদ

রাষ্ট্রভাষা কিংবা জাতীয় ভাষা কোনটা এ নিয়ে বিতর্ক, দাবি এবং আন্দোলন জাতীয় জীবনের অন্য আরও অনেক চাওয়া পাওয়ার মতোই একটা বিষয়। উপমহাদেশের ব্রিটিশ শাসকরা যখন আঞ্চলিক ভাষাকে সেই অঞ্চলের সরকারি কাজকর্ম ও শিক্ষার মাধ্যম করতে চাইল, তখন থেকেই ভাষা বিতর্কের শুরু। আর বাংলাদেশে (পূর্ব পাকিস্তানে) এ বিতর্কের শুরু দেশ বিভাগের সময় থেকে, যা এর পরিণতি পর্বে পৌঁছে ১৯৫২ সালে।

দেশ বিভাগকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান প্রস্তাবের আলোকে লিখিত- মুজিবুর রহমান খাঁ'র 'পাকিস্তান', হাবিবুল্লাহ বাহারের 'পাকিস্তান' এবং তালেবুর রহমানের 'পাকিস্তানের ক্রমবিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় (পূর্ব পাকিস্তান) পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার কথা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ঢাকা ও কলকাতার 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি' দেশ বিভাগের অনেক আগে থেকেই তাদের সভা-সমাবেশে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার বিষয়ে আলোচনা করত। এমনকি মওলানা আকরাম খাঁ তাঁর দৈনিক আজাদে লিখিত এক সম্পাদকীয়তে গোটা ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রস্তাব করেছিলেন। উর্দু ও হিন্দির সর্বভারতীয় ঝগড়া সামনে রেখে দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল, "সাহিত্যের দিক দিয়ে বাঙ্গালা ভারতের সমস্ত প্রাদেশিক সাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাঙ্গালা ভাষায় বিভিন্ন ভাব প্রকাশোপযোগী শব্দের সংখ্যাও বেশি। অতএব বাঙ্গালা সর্বদিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবি করিতে পারে।"[১]

১৯৪০ সালে পাকিস্তান প্রস্তাবের পর এবং দেশ বিভাগের আগে বাংলাদেশের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে জোর দাবি উপস্থাপন করেছিলেন। 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শীর্ষক নিবন্ধে আবুল মনসুর আহমদ বলেন, "উর্দু নিয়ে এই ধস্তাধস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাংলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের

১. দৈনিক আজাদ, সম্পাদকীয়, ২৩ এপ্রিল, ১৯৩৭

সংগে সংগে আমরা মুসলিম বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারব।"[২] এর এক বছরের মাথায় কবি ফররুখ আহমদ লিখেন, 'পাকিস্তানের অন্তত পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে একথা সর্বাধিসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই কয়েকজনের তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করেছেন, যা নিতান্তই লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে এই তাদের অভিমত। কি কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করেছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি।'[৩] পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা হওয়ার মাত্র এক মাস আগে ডক্টর মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ লিখেন, "কংগ্রেসের নির্দিষ্ট হিন্দির অনুকরণে উর্দু ভাষা পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইলে তাহা শুধু পশ্চাদগমনই হইবে। যদি বিদেশি ভাষা বলিয়া ইংরেজি ভাষা পরিত্যক্ত হয়, তবে বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষারূপে গ্রহণ না করার পক্ষে কোন যুক্তি নাই (কারণ উর্দু ভাষা পাকিস্তান ডোমিনিয়নের কোন অঞ্চলের ভাষা নয়, এই অর্থে উর্দু বিদেশী ভাষা)। যদি বাংলার ভাষার অতিরিক্ত কোন রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করিতে হয় তবে উর্দু ভাষার দাবি বিবেচনা করা কর্তব্য।[৪]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত (১৯৪৭, ১৪ আগস্ট) হবার পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণ আসন্ন হয়ে উঠল, তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেম এবং কয়েকজন বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রের উদ্যোগে ঢাকায় 'তমদ্দুন মজলিশ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠিত হয়। সংস্থা হিসেবে এই তমদ্দুন মজলিশই পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলতে গেলে একক ভূমিকা পালন করে। এই সংস্থা ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না, উর্দু' শীর্ষক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের এটাই প্রথম পুস্তিকা। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করে এতে প্রবন্ধ লিখেন- অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক আবুল মনসুর আহমদ এবং অধ্যাপক আবুল কাশেম।

তমদ্দুন মজলিশের তৎপরতা এবং উপরোল্লেখিত পুস্তিকার ভূমিকা ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ সময় তমদ্দুন মজলিস তার দ্বিতীয় উদ্যোগ হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, রাজনৈতিক নেতা ও খ্যাতনামা লোকদের স্বাক্ষর

---

২. 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান', আবুল মনসুর আহমদ, মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক সংখ্যা, ১৯৪৩
৩. 'পাকিস্তানঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য', কবি ফররুখ আহমদ, মাসিক সওঘাত, আশ্বিন সংখ্যা, ১৯৪৪
৪. 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা', ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, দৈনিক আজাদ, ২৯ জুলাই, ১৯৪৭

সম্বলিত একটি মেমোরেন্ডাম সরকারের কাছে পেশ করে এবং তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১২ নভেম্বর রাষ্ট্রভাষা বাংলার সমর্থক প্রাদেশিক মন্ত্রী হাবিবুল্লাহ বাহারের সভাপতিত্বে একটি সাহিত্য সভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত হয়। সবাই আলোচনা করেন অধ্যাপক আবুল কাশেম, কাজী মোতাহার হোসেন এবং কবি জসীমউদ্দীন প্রমুখ। এই সাহিত্য সভার পরপরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড নুরুল হক ভূইয়াকে আহবায়ক করে গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তার কাজ শুরু করে। ঘটনা দ্রুত এগিয়ে চলে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে ব্যাপক প্রচার কাজ শুরু হয়। এই সময় চকবাজার এলাকায় প্রচার কাজ চালাতে গিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অন্যান্যরা স্থানীয়দের দ্বারা ঘেরাও হন। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেল তলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্রথম ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের ভিপি ফরিদ আহমদ, মনির চৌধুরী, একেএম আহসান, (বিচারপতি) আব্দুর রহমান চৌধুরী প্রমুখ। সবার শেষে ছাত্ররা মিছিল করে সেক্রেটারিয়েটে যায়।

ভাষা আন্দোলন ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'। এই সংগ্রাম পরিষদ ৭ মার্চ ঢাকায় এবং ১১ মার্চ গোটা দেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ধর্মঘট আহ্বান করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ১১ মার্চ এক গুরুত্বপূর্ণ দিন। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে এই দিনেই প্রথম সংগঠিত গণভিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। সেদিন সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ মিছিল, ছাত্রদের পিকেটিং হয় এবং ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের ফলে ঢাকা শহর বিক্ষোভের নগরীতে পরিণত হয়। সেক্রেটারিয়েট এলাকায় পিকেটিং করতে গিয়ে কাজী গোলাম মাহবুব, শামসুল হক, অলি আহাদ, খালেক নওয়াজ, বায়তুল্লাহ, প্রমুখ পুলিশের লাঠিচার্জ এর মুখে পড়েন এবং কাজী গোলাম মাহবুব ও শেখ মুজিব গ্রেপ্তার হন। টিএন্ডটি এলাকায় পিকিটিং করতে গিয়ে সে সময়ের ডাকসু'র জিএস গোলাম আযম এবং অন্যান্য ১২ জন ছাত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ছাত্র জনতার উপর নির্যাতন চললেও সরকার আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে। পূর্ব পাকিস্তানের চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সাথে একটা চুক্তিতে আসেন। উল্লেখ্য, ১১ মার্চ ও ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে যে ঐতিহাসিক ছাত্র জনসভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে সভাপতিত্ব করেন আব্দুর রহমান চৌধুরী (পরবর্তিতে বিচারপতি)। ১৫ মার্চ স্বাক্ষরিত ৭ দফা চুক্তির প্রথম দফাতেই বলা হয়, পূর্ববঙ্গ পরিষদের চলতি অধিবেশনে বাংলাকে পূর্ববঙ্গের সরকারী ভাষা এবং সর্বস্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তাব পাস করতে হবে। দ্বিতীয় দফায় বলা হয়, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ সম্বলিত প্রাদেশিক পরিষদের

গৃহীত একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাতে হবে। এই চুক্তিতে সরকারের পক্ষে স্বাক্ষর করেন চীফ মিনিস্টার খাজা নাজিমুদ্দিন এবং সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে স্বাক্ষর করেন কামরুদ্দিন আহমদ। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে এই চুক্তি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। এ চুক্তিকে স্বাগত জানাতে গিয়ে 'ইত্তেহাদ' সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়তে বলেন, 'বিরাট শক্তি ও দুর্জয় বিরোধিতার মধ্যে সংগ্রাম করিয়া বাংলা ভাষা আন্দোলনকারীগণ যে সাফল্য লাভ করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে সোনার হরফে লিখিত থাকবে।'

সত্যই তাই। ৫২ এর ভাষা আন্দোলনের ভিত্তিই ছিল এই চুক্তি। সরকার কর্তৃক এই চুক্তি লঙ্ঘন করার প্রতিবাদেই ৫২'র ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়। চুক্তি হয়েছিল বলেই পরবর্তীকালে চুক্তি লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠেছিল এবং ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি ও সাফল্য লাভ করেছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের সাথে ১৫ মার্চ (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষা বিষয়ক চুক্তি হবার পর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে দুইটি বড় ঘটনা ঘটে। একটি হলো, পাকিস্তানের রাষ্ট্র প্রধান কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সফর। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ তিনি ঢাকায় আসেন। রেসকোর্সে (আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তখন এক বিশাল মাঠ) এক জনসভায় এবং ২৪ মার্চ কার্জন হলে তিনি ভাষণ দেন। রেসকোর্সে তিন লক্ষাধিক শ্রোতার সামনে এবং কার্জন হলের ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা তিনি ঘোষণা করেন।[৫] তবে রেসকোর্স মাঠে তার রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত ঘোষণার সময় শ্রোতাদের মধ্যে থেকে তাঁর এ ঘোষণার প্রতিবাদ উঠেছিল বলে অনেকে যা বলেন, সেটা একদমই মিথ্যা কথা। সেসময়ের ভাষা আন্দোলনের একজন সেনাপতি এবং পরবর্তীকালে কম্যুনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেতা

---

৫. এই ঘোষণা জিন্নাহর একটা ভুল ছিল। সেটা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। তার অসুস্থতার সময়ে তার ডাক্তারের সাথে আলাপকালে এ কথা তিনি বলেছিলেন। তিনি বলেন, "দেখো ডাক্তার, আমি জীবনে দুটি ভুল করেছি, তাও পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে। প্রথম ভুল করেছি, লাহোর প্রস্তাবকে বিকৃত করে যা দেশের একজন নেতা হিসেবে আমার পক্ষে আদৌ উচিত হয়নি। আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের কর্তৃত্ব মানবে না। তারা নিশ্চয়ই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ওদের উপর বিমাতাসুলভ আচরণ। পাকিস্তান প্রকৃতপক্ষে ওদের ত্যাগের ফলেই এসেছে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা ওদের প্রতি অবিচার করছে। আমার দ্বিতীয় ভুলটি আমি ঢাকায় গিয়ে করেছি। গভর্নর জেনারেল হিসেবে ভাষা সমস্যা নিয়ে কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আসলে ভাষা প্রশ্নের মীমাংসা পার্লামেন্টে করতে পারত। কিন্তু আমি কয়েকজন পূর্ব পাকিস্তানি নেতার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে ভাষা প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলাম। 'পূর্ব পাকিস্তানী ছাত্র ও জনগণের যে দৃঢ় মনোভাব লক্ষ্য করেছি, তাতে আমি বিশ্বাস করি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তাদের অযৌক্তিক নয়।" ('ইতিহাস কথা কয়', মোহাম্মদ মোদাব্বের, পৃষ্ঠা ২৪৫)।

মোহাম্মদ তোয়াহা, যিনি রেসকোর্সের জনসভায় এবং কার্জন হলে ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, বলেন তাঁর এক সাক্ষাৎকারে, "না সেখানে কোন প্রতিবাদ হয়নি। সে মিটিং এ লক্ষ লক্ষ লোক হয়েছিল। কে কোথায় প্রতিবাদ করবে? আর প্রতিবাদ করার জন্য সংগঠিত পরিকল্পনা এবং পরিবেশও ছিল না।[৬] রেসকোর্স ময়দান ও কার্জন হলে ভাষণ ছাড়াও কায়েদে আযম সময় বের করে ছাত্র প্রতিনিধিদের ডেকেছিলেন এবং বেশ সময় নিয়ে তাদের সাথে কথা বলেছিলেন। ভাষার প্রশ্ন ছাড়াও বিভেদ বিতর্ক মিটিয়ে ছাত্রদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পরামর্শ সহ নানা বিষয়ে তিনি কথা বলেন। এ বিষয়ের উপর কমিউনিস্ট নেতা তোয়াহা তাঁর সাক্ষাতকারে সুন্দর একটা বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ".....তাঁর (কায়দে আযমের) যে Imposing personality ছিল তাতে তিনি সবাইকে শ্রোতা হিসেবেই রেখে দিতেন। তিনি বলেই যেতেন। আর অন্যরা প্রভাবিত শ্রোতার মত শুনেই যেতাম। মাঝে মধ্যে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক হতো। তখন তিনি শুধু শুনতেন এবং প্রয়োজনবোধে মন্তব্য করতেন। ..... শাহ আজীজুর রহমান চাইতেন নিখিল পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ- অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠানের তিনি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন তা টিকে থাকুক। .....শাহ আজীজুর রহমান ও তার সঙ্গী সাথীরা আমাকে এবং আমার সহকর্মীদেরকে কায়েদে আযমের নিকট কমিউনিস্ট হিসাবে প্রমাণ করতে চাইতেন এবং বলতেন আমরা নাকি কায়েদে আযম সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করে থাকি। বৈঠকে শাহ আজীজ জাতির পিতা সম্পর্কে আমরা আপত্তিকর মন্তব্য করেছি বলে অভিযোগ আনলে আমি কিছু বলতে উদ্যত হই। তখন কায়েদে আযম আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'Your Quid-e-Azam doesn't mind'। আসলে তিনি তো খুব উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন, তাই যে কোন পরিস্থিতিকে শান্তভাবে 'ট্যাকল' করতে পারতেন। .....বৈঠকে..... আমরা রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত একটা মেমোরেন্ডাম (কায়েদে আযমকে) প্রদান করি। মেমোরেন্ডামের কাগজটা হাতে নিয়ে কায়েদে আযম জিজ্ঞেস করেন, 'What it is? আমি জবাব দেই, It is a memorandum on state-language with demand Bengali as one of the State Language of Pakistan. কায়েদে আযম উত্তর দেন, 'There could not be more than one state language. আমি তখন একাধিক রাষ্ট্রভাষার উদাহরণস্বরূপ কানাডা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উল্লেখ করি। তিনি জবাব দেন, 'Your Quid-e-Azam knows it well. You leave the matter with me.'..... কায়েদে আযমের দৃষ্টির এমন একটা গভীরতা বা শক্তি ছিল যার মাধ্যমে

৬. 'ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন', মোস্তফা কামাল, পৃষ্ঠা: ৭৭

অন্য কেউ কিছু বলার পূর্বেই ভাব দেখে তিনি তা বুঝে নিতেন এবং নিজের imposing personality দিয়ে স্বীয় মতের দিকে বিপক্ষকে টেনে আনতেন।[৭]

১৫ মার্চ ছাত্র ও পূর্ব-পাক সরকারের রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত চুক্তি স্বাক্ষরের পর দ্বিতীয় ঘটনা ছিল ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঢাকা সফর। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সমাবেশে দেয়া তাঁর বক্তৃতায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা বলেন। কিন্তু তার বক্তৃতার আগে সমাবেশের শুরুতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের তরফ থেকে তাকে রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য সমস্যা বিষয়ে একটা মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়।[৮] মেমোরেন্ডামটি ছাত্রদের পক্ষ থেকে পাঠ করেন

---

৭. 'ভাষা আন্দোলনঃ সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন', মোস্তফা কামাল, কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা: ৭৪,৭৫, ৭৬, ৭৭

৮. ১৩টি অনুচ্ছেদ-সম্বলিত মেমোরেন্ডামটিতে সংক্ষেপে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার চিত্র তুলে ধরারসহ সব অভাব-অভিযোগ ও প্রয়োজনের কথা বলা হয়। তার কিছু অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

"It is with a heart, throbbing with joy and emotion that, we, the students of the University of Dacca, welcome you in our midst as the first Prime Minister of our new, free and sovereign State of Pakistan. Even in the midst of these joyful surrounding, our thoughts naturally go back to the day when only a few months back we had the honour and privilege of welcoming the beloved Quaid-e-Azam in our midst. Though he is no more with us his message and his work are our most precious heritage which shall continue to guide and inspire us in future. ..... present pitiable plight of primary, secondary and university education in our province have compelled us to draw your kind attention ..... Steps should be taken..... female education is another subject which is also not receiving its due attention. ....we also urge on you, Sir, to introduce compulsory free military training in all the colleges and the universities..... we beg.... to encourage our youth to join the armed forces we need Army, Naval and Air Academies in this province. .....Sir, the food problem is causing us a great concern. ..... prices of essential commodities and cloth have gone beyond the purchasing power .....to increase our food production to make ourselves self sufficient.....this can only be made possible by abolishing the Permanent Settlement.... and re-organizing our land tenure system.....Sir, there cannot be any economic progress in the country unless it is industrialized. We hope, Sir, that in any industrial planning..... East Pakistan would legitimately get a major share..... We have accepted Urdu as our Lingua Franca but we also feel very strongly that, Bengali by virtue of its being the official language of the premier province .....(East Pakistan) and also the language of the 62% of the population of the state should be given its rightful place as one of the state languages together with Urdu.....Sir, you are aware of the pitiable plight of the people of East Bengal and Muslims in particular, who were victims of the worst kind of political oppression and economic exploitation. Sir, our legitimate claim in our Armed Forces and the Central Services, on the basis of population-percentage, shall be given effect to immediately.....

(মূল মেমোগ্রামের ফটোকপি 'ভাষা আন্দোলন: ৪৭ থেকে ৫২' গ্রন্থের ১১২ ও ১১৩ পৃষ্ঠাদ্বয়ের মাঝখানে পেস্ট করা রয়েছে।)

ডাকসু'র তৎকালীন জিএস গোলাম আযম। মেমোরেন্ডামটি বিষয়বস্তুর দিক দিয়া ছিল ঐতিহাসিক। যা ছিল, বলা যায়, যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার (১৯৫৪) চেয়েও বুদ্ধিদীপ্ত ও মর্মস্পর্শী। কায়েদে আযম এবং লিয়াকত আলী খান রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দু'র পক্ষে যে ঘোষণা দেন, সে ব্যাপারে তাদের কথা বলা এবং মোমোরেন্ডাম দেয়ার মাধ্যমে ছাত্রদের ক্ষোভ অনেকটাই দূর হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারী পল্টনের জনসভায় খাজা নিজামুদ্দিন যখন বললেন, 'উর্দুই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে' তখন ছাত্র সমাজ ফুঁসে উঠলো। তিনি ১৫ মার্চ, ১৯৪৮, ছাত্রদের সাথে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা এবং পূর্ব পাকিস্তানের অফিসিয়াল ভাষা করার চুক্তি করেছিলেন, সেই তিনিই ১৯৫২ সালে এসে চুক্তির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করলেন। এর তড়িৎ প্রতিক্রিয়া হল ছাত্রদের মধ্যে। ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হলো। এই তারিখেই ছাত্রনেতা আব্দুল মতিন এর নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠিত হয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ-এ রূপ লাভ করল। আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয় কাজী গোলাম মাহবুবকে। রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের উদ্যোগে ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয় এবং বিকেলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এ জনসভায় ছাত্রনেতাগণ এবং রাজনৈতিক নেতাদের মধ্য থেকে আবুল কাশেম এবং মাওলানা ভাসানীও বক্তৃতা করেন। বক্তৃতায় চুক্তি ভঙ্গের জন্য সরকারকে অভিযুক্ত করা হয়। এ জনসভা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয়া হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের প্রস্তুতিমূলক তৎপরতার মধ্যে অবশেষে আসে ঐতিহাসিক ২১ ফেব্রুয়ারি। ঢাকা শহরের সর্বত্র ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। কর্মপরিষদের বৈঠকে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিকে সামনে এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পরে ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা ছাত্রদের স্বাধীন সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়া হয়।

আসে ২১ ফেব্রুয়ারি। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একদিকে ছাত্রদের রাস্তায় বেরিয়ে আসার চেষ্টা আর অন্যদিকে পুলিশের প্রতিরোধ করার আক্রমণাত্মক প্রয়াস এক সাংঘর্ষিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। ছাত্রদের উপর নেমে আসে কাঁদানে গ্যাস, লাঠিচার্জ এবং অবশেষে গুলি। গুলিতে শহীদ হলো- সালাম, বরকত, শফিক, রফিক, জব্বার এবং আরো অনেকে। সৃষ্টি হল দুনিয়ায় ভাষার দাবিতে জীবন দেয়ার এক অনন্য, অতুল্য ইতিহাস।

ভাষা আন্দোলনের এই ইতিহাস নিয়ে অনেক নষ্টাচার হয়েছে এবং হচ্ছে। ভাষা আন্দোলনের যাদের টিকিটিও দেখা যায়নি, তারা আজ ভাষা আন্দোলনের জনক সেজে বসতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করে না। ভাষা আন্দোলন ছিল স্বদেশ, স্বজাতি, স্বধর্ম প্রেমিক এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বিমুক্ত ছাত্রদের একটা আন্তরিক আন্দোলন।

বাংলা ভাষা আন্দোলন উর্দু বৈরী ছিলনা, ছিল উর্দুর পাশে সমান আসনে বসার অধিকারের আন্দোলন। বামপন্থীদের কেউ কেউ এবং বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক কর্মী এই আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু সচেতন ছাত্ররা তা হতে দেয়নি। কিন্তু মতলবীরা তখন যা পারেনি পরবর্তীকালে তারা আন্দোলনের ইতিহাসকে হাইজ্যাক করে, বিকৃত করে তাদের স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। এর জন্যে দায়ী যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও। এদের মধ্যে অধ্যক্ষ আবুল কাশেম-এর কিছু চেষ্টা ছাড়া আর কারো কাছ থেকে ভালো কিছু পাওয়া যায়নি যা থেকে আমরা ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারি। ১৯৭৮ সালে ঢাকা ডাইজেস্ট সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের দিনের আলোতে না আনলে ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ঘটনাবলী তো বটেই ভাষা সৈনিকদের সবার নামও আমরা জানতে পারতাম না।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন আমাদেরকে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দিয়েছে, এই স্বাধীনতার চেতনা অবশেষে আমাদের দিয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। কিন্তু স্বাধীন হওয়ার পরেও আজ স্বকীয়তা আমাদের আহত, বিকলাংগ। বিকলাংগ, বিকৃত-দশা-রাজনীতি ও অর্থনীতি প্রসঙ্গে এখানে কিছু বলবো না। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল যে বাংলা ভাষার জন্য, সে বাংলা ভাষা আজ আগ্রাসী ষড়যন্ত্রের শিকার। আজ কলকাতার ভাষা-সংস্কৃতি আমাদের স্বকীয়তা গ্রাস করতে আসছে। তাদের শব্দ সংস্কৃতি এসে আমাদের শব্দ ও ভাষা সংস্কৃতিকে মুছে দিচ্ছে। আমাদের নিজস্ব পরিভাষা সন্ধান করতে গিয়ে বৈরী পরিভাষাকে এনে মানুষের ঘাড়ে চাপাচ্ছি। ইংরেজি ভাষার কিছু শব্দ তাড়াতে গিয়ে উনিশ শতকের একসময়ের ব্রাহ্মণ্য উদ্যোগের মতো সংস্কৃত ভাষার শব্দ এনে আমাদের অভিধান ভরিয়ে ফেলছি। এটা চলতে থাকলে আমরা বিদ্যাসাগরীয় বা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সংস্কৃত বাংলায় আবার ফিরে যাব।

সারা বছর তো আমরা বাংলা ভাষার কথা চিন্তা করি না। একুশে এসে যখন আমরা বাংলার প্রতি দরদ দেখাই, তখন যেন বাংলা ভাষার মাথার উপরের কালো মেঘের কথা একদিনের জন্য স্মরণ করি। তাতে আর কিছু না হোক, ভাষা সৈনিক, ভাষা শহীদরা লজ্জার হাত থেকে কিছুটা বাঁচবে। ■

সংশোধনী : মাসিক পৃথিবী জানুয়ারি ২০২৬ সংখ্যায় প্রকাশিত আবুল আসাদ লিখিত 'আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের ভাবনা' শীর্ষক লেখায় ১৫ পৃষ্ঠার তৃতীয় লাইনের শুরুতে ১৯২৪ এর জায়গায় ২০২৪ হবে। এই অনিচ্ছাকৃত প্রিন্টিং ভুলের জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। -কর্তৃপক্ষ

৩০ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

আধুনিক গণতন্ত্র ও ইসলামে সার্বভৌমত্বের ধারণা ঃ একটি তুলনা

ড. আহমদ আলী

জনগণ বনাম আল্লাহর সার্বভৌমত্ব

আধুনিক গণতন্ত্রে গণমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হয় এবং পরিবর্তিত হয়; ইসলামও তা-ই দাবী করে। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য এই যে, আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্র সীমাহীন ও নিরঙ্কুশ শক্তির মালিক। এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হল জনগণ কিংবা জনগণের পক্ষে সরকার। অর্থাৎ মানুষই সর্বেসর্বা। মানুষই সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। মানুষ ব্যতীত অন্য কোনো শক্তির কর্তৃত্ব মেনে নেয়া এবং তার নিকট জবাব দেবার চেতনা এখানে অবর্তমান। আল্লাহ তা'আলা আছেন- এ কথা স্বীকার করে নিতে গণতন্ত্রে যদিও বাধা নেই; তবে গণতন্ত্রের মূল চেতনা হল- যদি তিনি থাকেন, তা হলে তিনি আসমানেই থাকবেন। এই যমীনের মানুষের ওপর তাঁর কোনো কর্তৃত্ব চলবে না।

পক্ষান্তরে ইসলামের গণতান্ত্রিক খিলাফত আল্লাহ তা'আলার আইনের অনুসরণ করতে বাধ্য। এখানে সার্বভৌম ক্ষমতার নিরঙ্কুশ মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তা'আলা। কোনো ব্যক্তি, জনগণ বা সরকার এ ক্ষমতায় সামান্যতমও অংশীদার নয়। ইসলামী শাসন মূলত নিরঙ্কুশ আল্লাহরই শাসন।[১] মানুষ আল্লাহ তা'আলার খলীফা হিসেবে তাঁর বিধি-বিধানগুলোকে বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল মাত্র।

আইনপ্রণয়ন কর্তৃপক্ষ

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে আইনসভাই হল আইনগত সার্বভৌম। তাই আইনসভার সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে যে কোনো আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারেন। এখানে সাধারণত সংখ্যাগুরুর মতের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়; লোকদের গুণের বিচার করা হয় না। যেমন– কোনো দিকে যদি একান্ন ভোট পড়ে এবং এই ভোটারদের সকলেই মূর্খ, স্বার্থপর ও মূল বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ হয়; তবুও তাদের

---

১. এ ধরনের শাসনকে ইংরেজীতে 'Theocracy' বলা হয়। তবে ইউরোপ যে থিওক্র্যাসির সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্র্যাসি তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইউরোপ যে থিওক্র্যাসির সাথে পরিচিত, তাতে একটি বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠী (Priest class) আল্লাহ তা'আলার নামে নিজেদের বানানো আইন-কানুন চালু করে। এভাবে তারা কার্যত জনসাধারণের ওপর নিজেদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ইসলাম যে থিওক্র্যাসি পেশ করে, তা কোনো নির্দিষ্ট ধর্মীয় গোষ্ঠীর হাতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সাধারণ মুসলিমদের হাতে নিবদ্ধ থাকে। আর এই সাধারণ মুসলিমরা আল্লাহ তা'আলার কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত অনুসারে শাসনকার্য পরিচালনা করে।

মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হবে। অপর পক্ষে অন্য দিকে যদি এক ভোট কম অর্থাৎ ঊনপঞ্চাশ ভোট পড়ে এবং ভোটারদের সকলেই মূল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানকারী হয়ে থাকে; তবুও তাদের মতামতের কোনো মূল্য দেওয়া হবে না। এ কারণেই মহাকবি ইকবাল বলেছিলেন, "গণতন্ত্র এমন এক শাসনব্যবস্থা, যেখানে বান্দাহদের গণনা করা হয়; ওযন করা হয় না।"[২]

পক্ষান্তরে ইসলামে আল্লাহ তা'আলাই হলেন একমাত্র সার্বভৌম। আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী হলেন আল্লাহ তা'তালা। তবে শরী'আতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ নেই- এ ধরনের বহুবিধ শাসনতান্ত্রিক সমস্যায় ও সামাজিক জীবনের পরিবর্তনশীল প্রয়োজনাদির সাথে সংশ্লিষ্ট খুঁটিনাটি বিষয়ে ইসলামের মৌল নীতিমালার ভিত্তিতে শারী'আতের প্রাণসত্তার সাথে সামঞ্জস্যশীল আইন প্রণয়নের অধিকার ইসলাম মানুষকে দান করেছে। ইসলামের এ গতিশীল ব্যবস্থাটির নাম হলো ইজতিহাদ। বিকাশমান নিত্য-নতুন পরিস্থিতিতে উদ্ভূত নতুন নতুন প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের মাধ্যমে মানুষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তা ছাড়া আইনসমূহকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শাসনতান্ত্রিক রূপদান ও কার্যকর করার ব্যবস্থা নির্ধারণ এবং রাষ্ট্রীয় সংকট ও এর ছোট-খাট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এ ব্যাপারে মজলিসে শূরার সদস্যগণ ইসলামের মৌলিক নীতি ও উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রেখে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

তবে যে সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে তাতে তাঁর বক্তব্যকেই চূড়ান্ত আইন হিসেবে মেনে নিতে হয়। মজলিসে শূরার কোনো সদস্যই আল্লাহর কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাতের বিপরীত কোনো মত প্রকাশ করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে না। যেমন ইসলামে মদসহ তামাম নেশার বস্তু যে হারাম- এ ব্যাপারে শূরার সদস্যদের দ্বিমতের কোনো অবকাশ নেই। তবে হ্যাঁ, দ্বিমত হতে পারে, আইনের প্রয়োগ নিয়ে এবং তার ওপরেই আলোচনা হবে, এমনকি এ নিয়ে ভোটাভোটিও হতে পারে। যিনি ভাল টেকনিক উপস্থাপন করতে পারবেন, তাঁরটাই গ্রহণ করা হবে। তদুপরি যে সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় না, সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ লোকদের অভিমতকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

জনগণের ইচ্ছা বনাম আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে যেহেতু জনগণের সাধারণ ইচ্ছাই হল প্রকৃত সার্বভৌম, তাই সেখানে নির্দিষ্ট কোনো আদর্শিক মানদণ্ড থাকে না। জনগণের ইচ্ছাই হল ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যা নির্ণয়ের একমাত্র মাপকাঠি। আর জনগণের ইচ্ছা যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই গণতন্ত্র কোনোভাবেই স্থায়ী ও সুদৃঢ় নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; বরং এতে

২. নুরুদ্দীন, আবূ সাঈদ, মহাকবি ইকবাল, পৃ. ২৩৬

সুবিধাবাদ ও বহুরূপীভাব প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ কারণে গণতন্ত্রকে একটি আদর্শহীন নীতি-নিরেপক্ষ শাসনব্যবস্থাও বলা হয়। যেমন মদ্যপান যুক্তি, বুদ্ধি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি নিন্দিত কাজ। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের জোরেই যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮তম সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়; আবার ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বরে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববতী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ ঘোষণা করা হয়। তদ্রূপ ৫-১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জনসংখ্যা ও উন্নয়ন শীর্ষক কায়রো সম্মেলনের উদ্যোক্তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের জোরেই সমকামিতা, বহুগামিতা, গর্ভপাত ও অবৈধ যৌনাচারের মতো অতিশয় বিভৎস কুকর্মগুলোকে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ইসলামী ও ভ্যাটিকানের ধর্মীয় পক্ষের সফল প্রতিরোধ ও দৃঢ় অবস্থানের কারণে তা পুরো সফল হয়নি; তবে ব্রিটেন, আমিরেকাসহ পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামতের জোরে এ সমস্ত জঘন্য অপরাধগুলোকে আইন করে সিদ্ধ করা হয়েছে। তদুপরি গণতন্ত্রে নীতিগতভাবে রাষ্ট্রের সকল জনগণের ইচ্ছার কর্তৃত্বের কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে রাষ্ট্রের সকল জনগণের ইচ্ছার কর্তৃত্বের কোনো অস্তিত্বই বর্তমান নেই। এটি একটি কল্পনা মাত্র। এর নামে দলীয় ইচ্ছার নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব চলতে থাকে। জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি অংশের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন এতে খুব একটা দেখা যায় না। তা ছাড়া গণতন্ত্রে সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্তে সংখ্যালঘুকে দারুন দুর্ভোগ পোহাতে হয়। এ কারণেই রাজনীতি বিজ্ঞানে "tyranny of the majority" প্রত্যয়টি বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে আসছে।[৩]

পক্ষান্তরে ইসলামে রাষ্ট্র এক সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী নীতির ওপর চালিত হয়। আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রদত্ত নিয়ম-নীতি, নৈতিক বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলী দ্বারা জনগণের ইচ্ছাবাসনার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে হতে পারে না। এ সব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার। এ সবে পরিবর্তন সাধনের ইখতিয়ার কারো নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ফয়সালা দেবেন, তাতে কোনো মু'মিন নর-নারীর জন্য এ ইখতিয়ার নেই যে, সে তা লঙ্ঘন করবে। আর যে এ রূপ করবে সে সুস্পষ্ট গোমরাহীতে লিপ্ত হবে।[৪]

---

৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী টকভেলির কথায়-most danger is the tyranny of the majority-"গণতন্ত্রের প্রধান সমস্যাই হল সংখ্যাগুরুর স্বৈরাচার।"

৪. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব) : ৩৬

তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সরকার গঠন ও পরিচালনা জনগণের রায় অনুযায়ী হতে হবে–এ নীতিতে গণতন্ত্রের সাথে ইসলাম একমত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের জনগণ লাগামহীন ও স্বেচ্ছাচারী নয়। রাষ্ট্রের আইন-কানুন, মানুষের জীবনযাপনের মূলনীতি, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রীতিনীতি সবকিছুই জনগণের ইচ্ছানুযায়ী হতে হবে– এমন নয়। এমনও হতে পারে না যে, যে দিকে জনগণ ঝুঁকে পড়বে ইসলামী রাষ্ট্রও সে দিকেই কাত হয়ে পড়বে।

পাশ্চাত্য গণতন্ত্র সর্বতোভাবে সেক্যুলারিজমের সাথে জড়িত। এখানে রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্পূর্ণ আলাদা। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি কোন ধর্মের অনুশাসন মেনে চলতে আগ্রহী হয় তবে সে তা অনায়াসেই করতে পারে। কিন্তু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মানুষ হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এ সকল ক্ষেত্রে মানুষ নিজের বিদ্যা-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও ইচ্ছা-আকাঙ্খা ও প্রচলিত প্রথা অথবা মানব রচিত আইন অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়।

অপরদিকে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এখানে মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগের যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত সমাধান রয়েছে। তাই ইসলামে দীন ও রাষ্ট্র একই সূত্রে গ্রথিত। রাষ্ট্র থেকে দীনকে এবং দীন থেকে রাষ্ট্রকে বিচ্ছিন্ন করার কোনো সুযোগ নেই। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে খলীফা আবূ বাক্‌র (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণা[৫] থেকে জানা যায়, ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিটি মুসলিম নাগরিক ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক জীবনেও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলতে বাধ্য। বিশ্ববরেণ্য মুসলিম দার্শনিক কবি ইকবাল বলেন, ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য। এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস। তিনি ধর্মহীন রাজনীতিকে 'ভুতের কন্যা' ও 'পঙ্কিল মনোবৃত্তি'র পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন।

গণতন্ত্রের ইসলামী রূপ

গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের ধারণাটি কোনো মুসলিম নীতিগতভাবে মেনে নিতে পারে না। যদি কোনো মুসলিম এ বিশ্বাস পোষণ করে যে, জনগণই নিরঙ্কুশ ও চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী সার্বভৌম সত্তা, আইন-বিধান প্রণেতা এবং আল্লাহ তা'আলার দেওয়া আইনের

---

৫. যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আবূ বাকর (রা) বলেন,

وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا

"আল্লাহ তা'আলার কাসম! যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে (অর্থাৎ নামায পড়বে; কিন্তু যাকাত দেবে না), তাদের বিরুদ্ধে আমি লড়াই করবোই। কেননা, যাকাত হল সম্পদের অধিকার। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তারা যদি যাকাতরূপে কোনো মেষ শাবকও আদায় করে থাকত, যদি তারা এখন আমাকে তা আদায় করতে বিরত থাকে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য লড়াই করবো।" (আল বুখারী, আস-সহীহ, [কিতাবুয যাকাত], হা.নং: ১৩১২; মুসলিম, আস-সহীহ, [কিতাবুল ঈমান], হা.নং: ২৯)

পরিবর্তে মানবরচিত আইনই বর্তমান সময়োপযোগী এবং অধিক কল্যাণকর, তা হলে সে আর মুসলিম থাকবে না। এ কারণে অনেকেই 'গণতন্ত্র'-কে ইসলাম-পরিপন্থি একটি কুফরী মতবাদরূপে আখ্যায়িত করে থাকেন। অনেকের মতে, এটি শিরকের একটি আধুনিক রূপ।[৬]

তবে পারিভাষিক ও তাত্ত্বিক অর্থে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝায় (অর্থাৎ জনসাধারণের এবং জনসাধারণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সরকারের কর্তৃত্ব) তার সাথে ইসলামের বড় ধরনের মিল আমরা খুঁজে পাই।[৭] ক্ষেত্রবিশেষে শুধু মিলই নয়; বরং আধুনিক গণতন্ত্রের অনেক বিষয়ই[৮] ইসলাম থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে, বর্তমানে ইউরোপে, অতঃপর সমগ্র বিশ্বজুড়ে স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায্যাতা, সুশাসন ও সম্প্রীতির যে বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তা মূলত ইসলামী বিপ্লবেরই প্রলম্বিত ফসল ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্করণ।

গণতন্ত্রের মানে কখনো এ নয় যে, একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে নাস্তিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ হতে হবে। তার মানে এও নয় যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রের বিবেচনা অনুযায়ী কিছু স্থায়ী মৌলিক নীতিমালা সন্নিবেশ করা যেতে পারবে না। পাশ্চাত্যে প্রচলিত গণতন্ত্রেও নীতিগতভাবে কিংবা প্রকৃতপক্ষে এমন কিছু নিয়ম-নীতি আছে যেগুলোর ব্যাপারে কোনো বিতর্ক নেই বা যেগুলো পরিবর্তনের প্রশ্নই ওঠে না। গণতন্ত্রের অনেক প্রবক্তা জোর দিয়ে বলেন যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনো ব্যক্তিকেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধাচরণ করতে এবং একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে না। অনেকে এমনও বিশ্বাস করেন যে, কম্যুনিষ্ট পার্টির আদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর প্রকৃতি যেহেতু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বের কার্যকারণের সাথে সংঘাতময়, তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তার অস্তিত্বকে বৈধ হিসেবে স্বীকার করা উচিত নয়।

অতএব, যে দেশের জনসাধারণের অধিকাংশই মুসলিম হয়, যারা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং শরী'আতের আইন প্রবর্তনকে বাধ্যতামূলক দীনী কর্তব্য বলে বিশ্বাস করে, তা হলে তাদের গণতন্ত্র চর্চাও আল্লাহ তা'আলার বিধানসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত রেখেই

---

৬. মাওসূ'আতুল আদইয়ান ওয়াল মাযাহিবুল মু'আসিরাহ, খ. ২, পৃ. ১০৬৬-৭

ولا شك في أن النظم الديمقراطية أحد صور الشرك الحديثة ، في الطاعة ، والانقياد ، أو في التشريع ، حيث تُلغى سيادة الخالق سبحانه وتعالى ، وحقه في التشريع المطلق ، وتجعلها من حقوق المخلوقين

৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য: আমার রচিত 'গণতন্ত্র: ইসলামী দৃষ্টিকোণ'।

৮. যেমন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধসমূহ– ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ (তথা ব্যক্তির মৌলিক স্বাধীনতা), সাম্য ও সমানাধিকার, রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণ, আইনের শাসন, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন, জাতিগত সম্প্রীতি, নাগরিকদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও অধিকার সংরক্ষণ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতি।

ইজতিহাদের ব্যাপক ক্ষেত্রের দিকে ধাবিত হবে। মুসলিমদের গণতন্ত্র হবে আল্লাহ তা'আলাকে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মেনে নিয়ে শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফতের ধারণার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা। স্বাধীন জনমতের ভিত্তিতেই সরকার গঠিত হবে এবং সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম পরামর্শক্রমেই চলতে থাকবে। আর এ জন্য যুগোপযোগী ও কল্যাণকর যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে। পাশ্চাত্য জগতে ধর্মকে গণতন্ত্র থেকে পৃথক করার কারণে কোনো কোনো ইসলামপন্থীর মনে এই চিন্তার সৃষ্টি হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তি সম্ভব নয়। এ ধরনের চিন্তাধারার পেছনে যে বিশ্বাস কাজ করেছে তা হচ্ছে: দুটি পদ্ধতির মাঝে মৌলিক ও আদর্শগত পার্থক্য দেখা দিলে এদের একটিকে গ্রহণ করে অন্যটি থেকে দূরে থাকার জন্য তাকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে হবে। অথচ ইসলাম সব সময় নিজ আদর্শের বিশুদ্ধতা ও যোগ্যতার সাথে সাথে কোনো কোনো মানবীয় অভিজ্ঞতা, যা ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং যা মানুষের জন্য কল্যাণকর, তাকে নিজের কাঠামোর মধ্যে গ্রহণ করেছে।[৯]

কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদ 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটির ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করেছেন। আমরা মনে করি, ইসলাম সর্বার্থে গণতন্ত্র নয়; আর গণতন্ত্রও সর্বার্থে ইসলাম নয়। গণতন্ত্র হলো নিছক মানব-অভিজ্ঞতার নির্যাস। আর ইসলাম আল্লাহপ্রদত্ত একটি ব্যবস্থা; যা উদ্দেশ্য, পন্থা ও পদ্ধতিগত দিক থেকে একমাত্র নির্ভুল ও অতুলনীয়। সুতরাং আমরা আশা করি, আমাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থায় যোগসূত্র

---

৯. রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তদানীন্তন আরবে প্রচলিত–এমন অনেক আইন, যা ইসলামী শরী'আতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিংবা ইসলামী শরী'আহ বাস্তবায়নের ব্যাপারে সহযোগী ভূমিকা পালন করতো, সে ধরনের সব আইনই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। আর যেসব আইনের মধ্যে ত্রুটি বা ধ্বংসাত্মক কিছু ছিল, তিনি সে ধরনের অনেক আইনও সংশোধন ও কাটছাট করত ইসলামী শরী'আতের সাথে পূরো সঙ্গতিপূর্ণ করে গ্রহণ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম) -এর ইন্তিকালের পর তাঁর খলীফাগণ বিভিন্ন দেশ জয় করেন। তাঁরা সাধারণত বিজিত দেশের অমুসলিমদের বিধিবিধান ও রীতিনীতির প্রতি যথাসম্ভব সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁরা নতুন যে কোনো দেশ জয় করার পর সে দেশের প্রচলিত আইন পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্যে ন্যায় ও সুবিচার পরিপন্থী এবং মানবতার প্রতি যুলম ও বৈষম্যমূলক কোনো নীতি দেখতে পেলে তা মূলোচ্ছেদ করে একে ইসলামী আইনের ভিত্তিতে পুনর্বিন্যাস করতেন এবং প্রচলিত আইনের যেসব বিষয় ইসলামী আইনের সাধারণ নীতিমালার সাথে সাংঘর্ষিক নয় এবং মানবতার জন্য কল্যাণকররূপে বিবেচিত, সেগুলো বহাল রাখতেন। (মাওলানা মুহাম্মদ তাকী আমিনী, ইসলামী ফিকহের ঐতিহাসিক পটভূমি, পৃ. ২৪১-২)

এ কারণে আলিমগণ বলেন,.يعمل في الإسلام بفضائل الجاهلية- ''ইসলামেও জাহিলী যুগে অনুসৃত কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের অনুসরণ করা যাবে।" শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী (রাহ.) জাহিলী যুগে আরবে প্রচলিত ভালো নিয়ম-কানুন ও প্রথাগুলোকে ইসলামী শরী'আতের উপকরণ বলে আখ্যায়িত করেছেন। (শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলবী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, পৃ. ২৬৩-৪)

স্থাপনের জন্য আমাদের আদর্শ ও মূল্যবোধকে গ্রহণ না করে পশ্চিমা গণতন্ত্র তাদের আদর্শ (যেমন– ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র প্রভৃতি) আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে পারবে না। কারও কারও ভয়, গণতন্ত্র মানুষকে সকল ক্ষমতার উৎসে পরিণত করে, এমনকি এটি তাকে বিধিবিধান প্রণয়নেরও একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ড. ইউসুফ আল কারযাভী (রাহ.) বলেন,

'তাদের এ ভয়ের প্রতি কর্ণপাত করা উচিত হবে না। কেননা, আমরা এমন জনগণের কথা বলছি, যারা মুসলিম হিসেবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, যারা আল্লাহকে তাদের রব হিসেবে মেনে নিয়েছে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে তাঁর রাসূল এবং ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আশা করা যায়, এ ধরনের জনগণ এমন কোনো আইন প্রণয়ন করবে না, যা ইসলামের অকাট্য নীতি ও সিদ্ধান্তমূলক আইনের পরিপন্থি হবে। উপরন্তু, ইসলামের অকাট্য ধারার বিরুদ্ধে প্রণীত যেকোনো আইন বাতিল বলে গণ্য হবে–এমন একটি অনুচ্ছেদ সংবিধানে সংযোজন করে এ ভয় দূর করা যেতে পারে। কারণ, রাষ্ট্রের একমাত্র ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামই তার সকল বিধিবিধানের বৈধতার সূত্র। বিধিবিধান প্রণয়নের মালিক আল্লাহ তা'আলা–এ মূলনীতির মাধ্যমে আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, পরিবর্তনশীল জীবন আর পার্থিব প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইসলামের মৌলিক আইন ও শরী'আতের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিধি প্রণয়নের সীমিত ক্ষমতাও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে দান করেছেন।'[১০]

এ কারণে আধুনিককালের অনেক ইসলামী চিন্তাবিদ ও পণ্ডিত 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি পুরো পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে শর্তসাপেক্ষে শব্দটি গ্রহণ করে নিয়েছেন।

মহাকবি ড. মুহাম্মদ ইকবাল (রাহ.)-এর মতে– গণতন্ত্রের ভিত্তি যদি রুহানী ও নৈতিক হয়, তাহলে তা হবে উৎকৃষ্ট একটি পদ্ধতি। রুহানী গণতন্ত্রের মানে হলো– আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে, আল্লাহর চূড়ান্ত ক্ষমতার অধীনে মানুষের গণতন্ত্র। ইসলামী রাষ্ট্রকে এ কারণেই তিনি 'রুহানী গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করেছেন।[১১]

ইংরেজী সাময়িকী 'The New Era'-এর ২৮ জুলাই ১৯১৭ সংখ্যায় তিনি বলেন,

ইসলামে গণতন্ত্র অধিকাংশ ইউরোপীয় সমাজসমূহের মতো অর্থনৈতিক সুযোগের সম্প্রসারণ থেকে উৎপন্ন হয় না; বরং এটি একটি রূহানী নীতি, যা ওই কথার ভিত্তিতে এসেছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলো সুপ্ত শক্তির এমন একটি আধার, যার সম্ভাবনাসমূহকে এক বিশেষ গুণ ও চরিত্রের দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।[১২]

অর্থাৎ ইসলাম এ রকম এক গণতন্ত্র দিয়েছে, যা আল্লাহ তা'আলার আইনের অধীন।

---

১০. গণতন্ত্র ও ইসলাম, প্রাগুক্ত

১১. নুরুদ্দীন, আবু সাঈদ, মহাকবি ইকবাল, পৃ. ২৩৯

১২. তদেক

সাইয়িদ আবুল আ'লা মাওদূদী (রাহ.) বলেন,

'ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই ব্যবস্থার নাম, যেখানে জনমতের ভিত্তিতে সরকার গঠিত, পরিচালিত ও পরিবর্তিত হয়। ইসলামী শাসনব্যবস্থাও তদ্রূপ। তবে পাশ্চাত্য গণতন্ত্র থেকে আমাদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ভিন্ন। কেননা, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র লাগামহীন হয়ে থাকে; সেখানে জনগণের রায় হালালকে হারাম করে দিতে পারে। ... পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্র কুরআন ও হাদীস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। গোটা জাতি চাইলেও ইসলামের সীমানার বাইরে গিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না।'[১৩]

আমরা মনে করি যে, বর্তমানে ইসলামী চিন্তাবিদগণ যেহেতু আইনের শাসন, স্বাধীন বিচারব্যবস্থা, ভোটাধিকার, বাক্স্বাধীনতা, জনগণের নির্বাচিত সরকার ও জবাবদিহিতার কথা বলে থাকেন, আর এসব বোঝানোর জন্য আজকাল 'গণতন্ত্র' শব্দটিই বহুলভাবে ব্যবহার করা হয়, তাই সার্বিক বিবেচনায় শর্তসাপেক্ষে 'গণতন্ত্র' শব্দ গ্রহণ করার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। এর ফলে একদিকে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত ইসলাম সম্পর্কে ভুল ম্যাসেজ– 'ইসলাম আগ্রাসী ও কর্তৃত্ববাদী' তা দূর হবে, অপরদিকে মুসলিম বিশ্বে এর ফলে কর্তৃত্ববাদী রাজা-বাদশাহ, সামরিক একনায়ক ও স্বৈরশাসকগণ অন্যায় সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে না।

আমরা এও লক্ষ করছি, বিশ্বের ইসলামী দলগুলো এবং ইসলামী চিন্তাবিদগণ (বিচ্ছিন্ন কিছু দল ও লোক ছাড়া) ইতোমধ্যেই শর্তসাপেক্ষে 'গণতন্ত্র' পরিভাষাটি ব্যবহার করছেন।

আবার কেউ কেউ অগ্রসর হয়ে এমন কথাও বলছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রটিই ছিল মানবজাতির ইতিহাসে সর্বোত্তম জনকল্যাণমূলক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। গণতান্ত্রিক নীতিমালাই ছিল এ রাষ্ট্রব্যবস্থার মূলভিত্তি। তাঁদের এ কথায় গণতন্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য অবশ্যই পাশ্চাত্য ধাঁচের সেক্যুলার গণতন্ত্র নয়, যেখানে জনগণই হলো সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের মর্জি ও মতামতই হচ্ছে হক-নাহকের মানদণ্ড ও আইনের উৎস। বরং তাঁদের কথায় গণতন্ত্র দ্বারা উদ্দেশ্য হলো– Rulership of Allah on men by pious ruler with justice. "আল্লাহর শাসন জনগণের ওপর, সৎ লোকদের দ্বারা, ন্যায়বিচার সহকারে।" অন্য কথায়– আল্লাহর শাসন, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য। আল্লাহর এ শাসন আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে জনগণ পরিচালনা করবে। কাজেই ইসলামে গণতন্ত্র বলতে জনগণের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে সরকার গঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণকে বোঝানো হয়ে থাকে।[১৪]

---

১৩. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহ.)-এর সাক্ষাৎকার, (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী), পৃ. ২৬৩

১৪. নূরুল ইসলাম, ইসলাম ও অন্যান্য মতবাদ, পৃ. ২৯৩

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামে জনগণের সার্বভৌমত্ব নয়; জনগণের প্রতিনিধিত্বই কাম্য। কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দল বা শ্রেণীর একচেটিয়া শাসনক্ষমতা ইসলাম সমর্থন করে না। আধুনিক গণতন্ত্র জনগণের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্বের যে নীতি পেশ করেছে, তা বাস্তবতার দিক থেকেও ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক, পরিণামের দিক দিয়েও অত্যন্ত মারাত্মক। অধিকন্তু, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এটি একটি অতি বিতর্কিত বিষয়। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে একে বাদ দেওয়ার কথাও বলেছেন।

প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের অধিকারী একমাত্র তিনিই, যিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন, তাদের প্রতিপালন ও পরিবর্ধনের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করেছেন, যার ইচ্ছায় মানব জাতির ও সমগ্র সৃষ্টিজগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং যার শক্তিশালী আইনের বন্ধনে সৃষ্টিজগতের প্রতিটি বস্তু আবদ্ধ। তাঁর বাস্তব ও প্রকৃত সার্বভৌমত্বের অধীনে যে সার্বভৌমত্বের দাবী করা হোক না কেন তা নিছক বিভ্রান্তি বৈ অন্য কিছু নয়। এ বিভ্রান্তির আঘাত প্রকৃত সার্বভৌমের গায়ে লাগবে না; বরঞ্চ লাগবে সে নির্বোধ সার্বভৌমত্বের দাবীদারের ওপর, যে তার আপন মর্যাদা সম্পর্কে অজ্ঞ।

বস্তুত আল্লাহ তা'আলাকে সার্বভৌম মেনে নিয়ে মানব জীবনের শাসনব্যবস্থা খিলাফতের ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই খিলাফত নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক হতে হবে অর্থাৎ স্বাধীন জনমতের ভিত্তিতেই সরকার প্রধানের নির্বাচন হতে হবে। জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই শূরা বা পার্লামেন্টের সদস্যগণ নির্বাচিত হবেন। তাঁদের পরামর্শক্রমেই সরকারের যাবতীয় কার্যক্রম চলতে থাকবে। কিন্তু এসব কিছু এ অনুভূতি নিয়েই করতে হবে যে, দেশ আল্লাহ তা'আলার। আমরা মালিক নই; বরং তাঁর খলীফা, প্রতিনিধি। আমাদের প্রতিটি কাজের হিসাব প্রকৃত মালিকের নিকট দিতে হবে। আমাদের শূরা বা পার্লামেন্টের বুনিয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এ হতে হবে যে, আল্লাহ তা'আলার কুর'আন ও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহই হবে সকল আইনের উৎস। যেসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার আইনে সুস্পষ্ট হিদায়াত নেই, সেসব ব্যাপারে পার্লামেন্ট বা বৈধ আইনী কর্তৃপক্ষ পরামর্শের ভিত্তিতে আইন রচনা করতে পারবে। কিন্তু এসব আইন অবশ্যই সেই সামগ্রিক কাঠামোর মেজাজ ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল হতে হবে, যা আল্লাহ তা'আলার মৌলিক হিদায়াত আমাদের জন্য তৈরি করে দিয়েছে।

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين .

রমযান গুনাহ মাফের মাস: মুমিনের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

রমযান ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাস, যা শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সংযমের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি বান্দার আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ। এই মাসে আল্লাহ বান্দার প্রতি দয়া ও রহমতের অনন্য সম্ভাবনা খুলে দেন, যা পূর্বের পাপ মুছে দেওয়ার মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। রমযানের ইবাদতগুলো যেমন: নামাজ, রোযা, দান, কুরআন তিলাওয়াত সবই মানব চরিত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য ও তাকওয়া প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। এ মাসে লাইলাতুল কদরের উপস্থিতি বান্দাদের জন্য গুনাহ ক্ষমার এক বিশেষ সুযোগ প্রদান করে, যা সাধারণ মাসের তুলনায় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করে। রমযান কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক দিক থেকেও এটি সহানুভূতি, দান ও নৈতিক দায়িত্ববোধ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে। এ মাসে শয়তানের প্রভাব সীমিত হওয়ায় বান্দা সহজে গুনাহ থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হয়। রমযান বান্দাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্গঠন, তাওবা ও ক্ষমার অনুশীলনের পরিবেশ প্রদান করে। এটি কেবল আধ্যাত্মিক অনুশীলন নয়, বরং নৈতিক শিক্ষার মাধ্যমে সমাজে কল্যাণ এবং জ্ঞান ও নৈতিকতার বিকাশ নিশ্চিত করে। গবেষণাধর্মী দৃষ্টিকোণ থেকে রমযান একটি পূর্ণাঙ্গ মানব উন্নয়ন ও গুনাহমুক্তির মাস হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং, রমযানকে মানব জীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি অনন্য সময় হিসেবে ধরা যায়।

১. **রমযান আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমার মৌসুম :** রমযান এমন এক মাস, যা বান্দার আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহর বিশেষ প্রশিক্ষণ হিসেবে প্রেরিত। এই মাসে বান্দার প্রতিটি ইবাদত, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা আল্লাহর নিকট মূল্যবান হিসেবে গণ্য হয়। রোযার মাধ্যমে বান্দা নফসের শক্তি দমন করে, যা গুনাহের প্রবণতা হ্রাস করে এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে। পরম করুণাময় আল্লাহ এই মাসে বান্দার পূর্বের গুনাহ মাফ করার সুযোগ দেন, যাতে সে নতুনভাবে আত্মসংযমে অভ্যস্ত হতে পারে। ফলে রমযান আল্লাহর দয়া ও রহমতের মাস হিসেবে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

"রমযান মাসই যেখানে কুরআন মানুষদের জন্য হেদায়েত ও স্পষ্ট পথনির্দেশ হিসেবে নাজিল করা হয়েছে।"[১] এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

---

১. সূরা আল-বাকারা: ১৮৫।

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ.

"রমযান এলে রহমতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়।"[২]

২. **রমযান পূর্ববর্তী গুনাহ মাফের প্রতিশ্রুতি মাস :** রমযান এমন এক সময়ে আল্লাহ বান্দাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন, যা পূর্বের পাপ ও ত্রুটিকে পরিশোধের সুযোগ দেয়। যে বান্দা এই মাসে সৎ নিয়ত ও ঈমানের সঙ্গে রোযা পালন করে, আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মুছে দেন। এটি মানবজীবনের পুনর্গঠনের এক অনন্য সুযোগ, যা বান্দাকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে পুনর্জীবিত করে। রমযানের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাকে নিজ দয়ার সাথে পরিচয় করান এবং ক্ষমার মাধ্যমে অন্তরকে প্রফুল্ল করেন। ফলে রমযান কেবল উপবাস নয়, বরং এটি গুনাহমুক্তির এক পরীক্ষিত ও প্রমাণিত মাধ্যম। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

"যে ব্যক্তি ঈমান ও প্রতিদানের উদ্দেশ্যে রমযানে রোযা রাখে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করা হবে।"[৩]

৩. **রমযান তাকওয়ার মাধ্যমে গুনাহ নির্মূলের মাস :** রমযানের মৌলিক উদ্দেশ্য হলো মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা, যা ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি। তাকওয়া এমন এক আত্মিক শক্তি, যা মানুষকে গোপনে ও প্রকাশ্যে গুনাহ থেকে বিরত রাখে। রোযার মাধ্যমে মানুষ যখন হালাল থেকেও বিরত থাকে, তখন হারাম বর্জনের ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় হয়। এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ধীরে ধীরে গুনাহের অভ্যাস ভেঙ্গে দেয় এবং অন্তরকে আল্লাহভীতিতে পরিপূর্ণ করে। ফলে তাকওয়ার আলোয় আল্লাহ বান্দার পাপসমূহ ক্ষমা করে তাকে নাজাতের পথে অগ্রসর করেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

"হে বিশ্বাসীরা! তোমাদের উপর রোযা নির্ধারিত হয়েছে যেমন পূর্ববর্তীদের উপর নির্ধারিত হয়েছিল, যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন কর।"[৪]

৪. **রমযান নফস দমনের মাধ্যমে ক্ষমা অর্জনের মাস :** মানুষের অধিকাংশ গুনাহের উৎস হলো অবাধ্য নফস ও লাগামহীন প্রবৃত্তি। রমযান সেই নফসকে নিয়ন্ত্রণে আনার একটি কার্যকর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ক্ষুধা, পিপাসা ও সংযম নফসের অহংকার ভেঙ্গে দেয় এবং তাকে বাধ্য করে আত্মসমর্পণে। নফস দুর্বল হলে শয়তানের কুমন্ত্রণা কার্যকর হয় না এবং পাপের পথ সংকুচিত হয়। এই অবস্থায় বান্দা আল্লাহর ক্ষমার উপযুক্ত হয়ে ওঠে এবং গোনাহ থেকে মুক্তি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন : الصِّيَامُ جُنَّةٌ.

---

২. নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং- ২১০০।

৩. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৩৫।

৪. সূরা আল-বাকারা: ১৮৩।

"রোযা একটি ঢাল, যা পাপ ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।"[৫]

৫. **রমযান শয়তানের প্রভাব হ্রাসের মাধ্যমে গুনাহ মাফের মাস :** শয়তান মানুষের গুনাহের প্রধান প্ররোচক ও পথপ্রদর্শক। রমযান মাসে আল্লাহ শয়তানের প্রভাব সীমিত করে দেন, যাতে মানুষ সহজে পাপ থেকে দূরে থাকতে পারে। এই মাসে পাপের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ হ্রাস পায় এবং ইবাদতের প্রতি ঝোঁক বৃদ্ধি পায়। পরিবেশগত ও আত্মিক এই সহায়তা বান্দাকে তাওবার পথে এগিয়ে নেয়। ফলে রমযান শয়তানমুক্ত পরিবেশে গুনাহ মাফ করিয়ে নেওয়ার শ্রেষ্ঠ সুযোগে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ.

"যখন রমযান মাস আসে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেওয়া হয়, জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে বেঁধে রাখা হয়েছে।"[৬]

৬. **রমযান দোয়ার মাধ্যমে গুনাহ ধুয়ে নেওয়ার মাস :** রমযান দোয়া কবুলের বিশেষ সময় হিসেবে চিহ্নিত। এই মাসে বান্দার অন্তর আল্লাহর দিকে অধিক ঝুঁকে পড়ে এবং দোয়া আন্তরিক হয়। বিশেষত রোযাদারের দোয়া আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করেন না; এটি নববী ঘোষণায় প্রমাণিত। বান্দা যখন চোখের অশ্রু ও ভাঙ্গা হৃদয় নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ফলে দোয়ার মাধ্যমে রমযান বান্দার গোনাহ ধুয়ে ফেলার মাসে পরিণত হয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ.

"যে ব্যক্তি রোযা রেখে ইফতার করে, তার দোয়া প্রত্যাখ্যাত হয় না।"[৭]

৭. **রমযান কিয়ামতের সুপারিশ ও আত্মপ্রকাশের মাস :** রমযান মাসে বান্দার প্রতিটি সৎ আমল কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সুপারিশ করবে। রোযা কেবল ক্ষুধা ও পিপাসা ত্যাগের মাধ্যম নয়, বরং এটি বান্দার সৎ অভ্যাস ও নৈতিক অর্জনের স্বাক্ষী। এই আমল কিয়ামতের আদালতে তার পক্ষে আবেদনকারী হিসেবে উপস্থাপিত হবে। সুপারিশের মাধ্যমে বান্দা তার অতীতের গুনাহ থেকে মুক্তি ও নতুন নৈতিক সুযোগ পাবে। ফলে রমযান কেবল ইবাদতের মাস নয়, এটি বান্দার পাপমুক্তি ও সুপারিশের এক অনন্য ব্যবস্থা। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

الصيام والقرآن يشفعان للعبد.

"রোযা তার প্রতি বান্দার পক্ষে সুপারিশ করবে।"[৮]

---

৫. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১৬২।
৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-১০৭৯।
৭. ইবন মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-১৭৫৩।
৮. হাকিম, আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন, হাদীস নং-২০৮০।

৮. **রমযান জান্নাতের রাইয়্যান দরজায় প্রবেশ করার মাস :** রমযানের রোযাদারদের জন্য জান্নাতে বিশেষ দরজা খোলা আছে, যা কেবল তাদের জন্য বরাদ্দ। এই দরজা বান্দার পাপমুক্তি, তাওবা এবং ধারাবাহিক ইবাদতের স্বীকৃতি হিসেবে কাজ করে। যারা রমযানে সৎ নিয়ত ও তাকওয়ার সঙ্গে রোযা পালন করে, তারা এ দরজার যোগ্যতা অর্জন করে। রাইয়্যান দরজায় প্রবেশ মানে গুনাহ থেকে মুক্তি এবং নাজাতের নিশ্চিত সংকেত পাওয়া। এটি রমযানের গুরুত্ব ও ক্ষমার সর্বোচ্চ নিদর্শন হিসেবে আল্লাহ প্রদত্ত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ "

"নিশ্চয়ই জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে বলা হয় রাইয়্যান, কিয়ামতের দিন রোজাদার ব্যতীত এই দরজা দিয়ে আর কেউ ই প্রবেশ করতে পারবে না। বলা হবে : কোথায় রোজাদারগণ? তখন রোজাদার ব্যতীত আর কেউ প্রবেশ করবে না। যখন সব রোজাদারদের প্রবেশ নিশ্চিত হবে তখন রাইয়ান দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।"[৯]

৯. **রমযান লাইলাতুল কদরের মাহাত্ম্য ও পাপমুক্তির মাস :** রমযানের মধ্যবর্তী রাতগুলো 'লাইলাতুল কদর' গুনাহ মাফের এক অনন্য সুযোগ। এই রাতেগুলোতে বান্দার দোয়া ও ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়। লাইলাতুল কদরের এক রাত সাধারণ ইবাদতের হাজার মাসের সমতুল্য ফল দেয়। বান্দা যখন সৎ নিয়ত ও গভীর আত্মসমর্পণের সঙ্গে ইবাদত করে, আল্লাহ তার পূর্বের সব গোনাহ মাফ করে দেন। ফলে রমযান ও লাইলাতুল কদরের মিলনে বান্দার আত্মা পাপমুক্ত ও আল্লাহভক্ত হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ.

"লাইলাতুল কদর হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।"[১০]

১০. **রমযান কুরআনের প্রকাশ ও গুনাহ মাফের সহায়ক মাস :** রমযানে কুরআন নাজিল করা হয়, যা বান্দাকে গুনাহ ত্যাগের নির্দেশনা ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কুরআনের শিক্ষাগুলো প্রতিটি বান্দার হৃদয়ে আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করে। রোযার মাধ্যমে কুরআন অনুসরণ সহজ হয় এবং পাপমুক্তির পথ সুগম হয়। কুরআনের নির্দেশ মেনে চলা বান্দাকে ন্যায্য ও সৎ জীবনের দিকে পরিচালিত করে। ফলে রমযান কেবল ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের মাস নয়, এটি বান্দার গুনাহমুক্তি ও নৈতিক পুনর্গঠনের মাস। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ.

---

৯. বুখার, আস-সহীহ, হাদীস নং- ১৮৯৬।

১০. সূরা আল-কদর: ৩।

"রমযান মাসই যেখানে কুরআন মানুষদের জন্য হেদায়েত হিসেবে নাজিল করা হয়েছে।"[১১]

১১. **রমযান নৈতিক পুনর্গঠন ও আত্মসমালোচনার মাস :** রমযান বান্দাকে নিজের অতীত আচরণ ও গোনাহের উপর চিন্তাভাবনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। প্রত্যেক রোযাদার আত্মসমালোচনার মাধ্যমে নিজের ভুলগুলো স্বীকার করে এবং তাওবার জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। এই মনন ও আত্মসমর্পণ অন্তরের নৈতিক পুনর্গঠন ঘটায় এবং পাপমুক্তির পথ সুগম করে। অন্তরের এই পরিশ্রম তাকে নফস ও শয়তানের প্ররোচনার বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে। ফলে রমযান কেবল শারীরিক উপবাস নয়, এটি আত্মিক পুনর্জাগরণ ও নৈতিক শুদ্ধির মাস। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে বিশ্বাসীরা! সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"[১২]

১২. **রমযান কুরআনের তত্ত্বাবধানে গুনাহ ত্যাগের মাস :** রমযান মাসে কুরআন নাজিল করা হয়, যা বান্দাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করে। কুরআনের নির্দেশনা অনুসরণ করে রোযাদার সহজে সৎ পথে চলতে পারে এবং পাপ থেকে বিরত থাকে। প্রতিটি আয়াত বান্দাকে নৈতিক পুনর্গঠনের চাবিকাঠি হিসেবে কাজ করে। কুরআনের আলোয় চলা বান্দাকে গুনাহমুক্ত ও আল্লাহভক্ত হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে রমযান কেবল ক্ষুধা নিয়ন্ত্রণের মাস নয়, এটি নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনের মাস। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرآنُ هُدًى لِلنَّاسِ.

"রমযান মাসে কুরআন মানুষদের জন্য হেদায়েত হিসেবে নাজিল করা হয়েছে।"[১৩]

১৩. **রমযান ইবাদতের ধারাবাহিকতা ও স্থায়িত্বের মাস :** রমযান বান্দাকে দৈনন্দিন ইবাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার শিক্ষা দেয়। এই ধারাবাহিকতা নৈতিক চরিত্রে শক্তিশালী ছাপ ফেলে এবং গুনাহমুক্তি নিশ্চিত করে। রোযার মাধ্যমে বান্দা প্রতিটি ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, যা তার আত্মসংযমকে গভীর করে। ধারাবাহিক ইবাদত ও আত্মনিয়ন্ত্রণ একত্রে গুনাহের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরক্ষা গড়ে তোলে। ফলে রমযান কেবল মাসিক ইবাদত নয়, এটি আত্মশুদ্ধি ও স্থায়ী নৈতিক উন্নতির মাস। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَاللَّهِ.

"নামাজ কায়েম কর এবং যাকাত দাও। যা ভালো কাজ তোমরা নিজের জন্য এগিয়ে পাঠাও, তা আল্লাহর নিকট পাবে।"[১৪]

---

১১. সূরা আল-বাকারা: ১৮৫।

১২. সূরা আন-নূর: ৩১।

১৩. সূরা আল-বাকারা: ১৮৫।

১৪. **রমযান নৈতিক প্রশিক্ষণ ও আত্মসমর্পণের মাস :** রমযান মানুষকে নৈতিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ শেখায়। বান্দা ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সহ্য করার মাধ্যমে নিজের অভ্যাস ও প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। এই প্রশিক্ষণ গুনাহ দূর করার এবং তাওবার পরিবেশ সৃষ্টিতে কার্যকর। একজন বান্দা যখন নিয়মিত রোযা পালন করে, তার অন্তর আল্লাহর ভক্তিতে আবদ্ধ হয়। ফলে রমযান কেবল শারীরিক পরীক্ষা নয়, এটি গুনাহমুক্তি ও আত্মিক পরিপূর্ণতার মাস। রোযা রাখার জন্য মহান আল্লাহ মানুষকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ مِنْ جَهَنَّمَ سَبْعِينَ عَامًا.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছরের দূরত্বে রাখবেন।"[১৫]

১৫. **রমযান আত্মশুদ্ধি ও অন্তর পরিশুদ্ধির মাস :** রমযান বান্দাকে আত্মশুদ্ধি ও অন্তর পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী করে। রোযা ক্ষুধা ও তৃষ্ণার সীমা অতিক্রম করে নিজের নফস নিয়ন্ত্রণ শেখায়। এই নিয়ন্ত্রণ গুনাহের আকর্ষণ দূর করে এবং আত্মাকে পবিত্র রাখে। পরিশুদ্ধ অন্তর আল্লাহর ক্ষমা ও রহমতের জন্য প্রস্তুত থাকে। ফলে রমযান বান্দার অন্তরকে গুনাহমুক্ত ও আল্লাহভক্ত হিসেবে গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

"নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সেই বিশ্বাসীরা, যারা তাদের নামাজে বিনয়ী।"[১৬]

১৬. **রমযান দান ও সহানুভূতির মাধ্যমে গুনাহমুক্তির মাস :** রমযানে দান, যাকাত ও স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে সামাজিক দায়বদ্ধতা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই সামাজিক কল্যাণ আল্লাহর দয়া ও রহমতের সঙ্গে জড়িত। বান্দা যখন দান করে, তখন তার আত্মা পাপমুক্তির পথে অগ্রসর হয়। উম্মাহগত সহানুভূতি ও সাহায্য গুনাহ থেকে মুক্তির পরিবেশ তৈরি করে। ফলে রমযান ব্যক্তি ও সমাজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাস। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْمُسْلِمُونَ وَالْمُسْلِمَاتُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ.

"মুসলিম পুরুষ ও নারী, বিশ্বাসী পুরুষ ও নারী একে অপরের বন্ধু ও সহায়ক।"[১৭]

১৭. **রমযান গুনাহমুক্তি ও নফস নিয়ন্ত্রণের মাস :** রমযান মানুষের নফসকে স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকে আলাদা করার চূড়ান্ত পরীক্ষা। ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে বান্দা নিজের আত্মকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। এই নিয়ন্ত্রণ নফসের অহংকার ভেঙ্গে

---

১৪. সূরা আল-বাকারা: ২৬৭।
১৫. নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীসনং-২২৪৭।
১৬. সূরা মুমিনুন: ১-২।
১৭. সূরা তাওবা: ৭১।

দেয় এবং শয়তানের প্ররোচনা বন্ধ করে। ফলে রোযার মাধ্যমে গুনাহ ধ্বংস হয় এবং বান্দা ক্ষমাপ্রার্থী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই অনুশীলন রমযানকে গুনাহমুক্তি ও আধ্যাত্মিক পুনর্গঠনের মাসে পরিণত করে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন :

الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّةِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْقِتَالِ.

"রোযা হলো জিহাদের ময়দানে ব্যবহৃত ঢালস্বরূপ যা জাহান্নামের আগুন থেকে তোমাদের বাঁচাবে।"[১৮]

১৮. রমযান আত্মসমালোচনা ও তাওবার মাস : রমযান বান্দাকে নিজের পূর্ববর্তী ভুল ও গুনাহ পর্যালোচনা করতে উদ্বুদ্ধ করে। বান্দা যখন অতীতের ত্রুটির জন্য আল্লাহর কাছে বিনীত হয়, তখন সত্যিকার তাওবা কার্যকর হয়। এই আত্মসমালোচনা তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে এবং নৈতিক পুনর্গঠন ঘটায়। তাওবার মাধ্যমে বান্দা গুনাহ থেকে মুক্তি লাভ করে এবং নতুনভাবে আল্লাহভক্ত জীবনের পথে এগোয়। ফলে রমযান পাপমুক্তি ও আত্মশুদ্ধির মাস হিসেবে পরিপূর্ণ হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"হে বিশ্বাসীরা! সবাই আল্লাহর কাছে তাওবা কর, যাতে তোমরা সফল হও।"[১৯]

পরিশেষে বলা যায় যে, রমযান শুধুমাত্র ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিয়ন্ত্রণের মাস নয়, বরং এটি বান্দার আত্মিক পুনর্গঠন ও গুনাহমুক্তির মাস। এই মাসে দোয়া, কুরআন তিলাওয়াত, ইবাদত ও দানের মাধ্যমে বান্দা পূর্ববর্তী পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। লাইলাতুল কদর এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত রমযানকে ক্ষমা ও নৈতিক পুনর্গঠনের উচ্চশিখরে উন্নীত করে। রমযান সামাজিক দায়িত্ব, সহানুভূতি এবং নৈতিকতা বৃদ্ধিতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। নফস ও শয়তানের প্রভাব সীমিত হওয়ায় বান্দা সহজে সৎ পথে চলতে পারে। গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণে দেখা যায়, রমযান একটি স্বাভাবিক প্রশিক্ষণ যা আত্মসংযম, ধৈর্য ও তাকওয়া বৃদ্ধি করে। এই মাসের ধারাবাহিকতা ও নিষ্ঠা বান্দাকে স্থায়ী নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে পরিচালিত করে। ফলে রমযান মানব জীবনের নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের জন্য অপরিহার্য। এটি গুনাহমুক্তি, ক্ষমা, নৈতিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক পরিপূর্ণতার এক অনন্য সম্মিলন। অতএব, রমযানকে মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নের মাস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৮. নাসাঈ, আস-সুনান, হাদীস নং- ২২৩১।

১৯. সূরা আন-নূর: ৩১

থাইল্যাণ্ড-কম্বোডিয়া সংঘাত

মীযানুল করীম

থাই অর্থ স্বাধীন। থাইল্যাণ্ড অর্থ স্বাধীন ভূমি। যে ভূমি কোন দিন পরাধীন হয় নাই। থাইল্যাণ্ডে বিশেষ মর্যাদার বিষয় হলো ৩টি, বৌদ্ধ ধর্ম, রাজবংশ, সাদা হাতি। থাইল্যাণ্ড সাদা হাতির দেশ। থাইল্যাণ্ডে সাদা হাতি সবচাইতে মর্যাদাবান। এই দেশ দীর্ঘদিন সামরিক শাসনের অধীনে ছিল। কিন্তু এর শিল্প উন্নতিতে বাধা পড়ে নাই। এইজন্য অর্থনীতিতে খুব শক্তিশালী।

থাইল্যাণ্ডের সাবেক নেতা জেনারেল থানম কীর্তিকা চরণ সারা বিশ্বে পরিচিত।

অপরদিকে 'কম্বোডিয়া' অতীতে ছিল হিন্দু রাজ্য। কম্বোডিয়া কম্বোজ নামে পরিচিত। এর 'এ্যাংকরভাট' মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও আছে। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া দক্ষিণ এশিয়ার জোট 'আসিয়ান' এর সদস্য। একই জোটের সদস্য হিসেবে উভয় দেশই নির্বিবাদী আচরণ করছে।

উল্লেখযোগ্য যে, থাই ভাষার সাথে আমাদের অনেক মিল। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব থাকায় সংস্কৃত ও পালি ভাষার ছাপ রয়েছে। যেমনঃ থাইল্যাণ্ডের রাজার নাম ছিল ভূমিবল। রাজধানী ব্যাংককের একটি সড়কের নাম ছিল রাজবীধি। থাইল্যাণ্ডের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কও ঘনিষ্ট। থাইল্যাণ্ডের বাজনানী ব্যাংককের বামরুনগ্রাদ হাসপাতাল বাংলাদেশের সুপরিচিত। কম্বোডিয়ার সাথেও বাংলাদেশের সুসম্পর্ক রয়েছে।

থাইল্যাণ্ড-কম্বোডিয়া যুদ্ধের বিভিন্ন দিক

সীমান্ত লড়াই বন্ধে দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সই-

থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে ২০ দিন ধরে সংঘাতের পর কয়েক মাসের দ্বিতীয় যুদ্ধবিরতি চুক্তি করেছে। ফলে লড়াই বন্ধ হয়েছে। থাইল্যাণ্ডের সীমান্তে দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাথাপন নাকফানিট এবং কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সেইহা চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করেন।

দুই দেশের বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ২৭ ডিসেম্বর দুপুর ১২টায় যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছে। যৌথ বিবৃতিতে দুই মন্ত্রী বলেন, 'মোতায়েন করা সেনারা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে।'

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বিবৃতিতে আরো বলা হয়, 'যেকোনো শক্তিবৃদ্ধি উত্তেজনা বাড়াবে এবং দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের প্রচেষ্টায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'

তিন সপ্তাহের লড়াইয়ে উভয়পক্ষে ১০১ জন নিহত এবং পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত। কয়েক বছরে এটি সবচেয়ে তীব্র লড়াই, যুদ্ধবিমান দিয়ে হামলাসহ রকেট বিনিময় ও ভারী কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল সুরাসান কংসিরি ২ ঘণ্টা পর রয়টার্সকে জানিয়েছেন, যুদ্ধবিরতি হচ্ছে। তিনি বলেন, 'গোলাগুলির কোনো খবর পাওয়া যায়নি।'

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার আগে কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছিল, ভোর রাতে থাই বাহিনী হামলা চালিয়েছে। তবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর থেকে তারা সংঘাত হয়েছে বলে জানায়নি।

এর আগে, জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। ডিসেম্বরের শুরুতে সংঘর্ষ শুরু হলে চুক্তি ভেঙে পড়ে। এক শতাব্দীরও বেশি আগে ফরাসিরা কম্বোডিয়ার দখলদারিত্ব ছেড়ে চলে যাওয়ার পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দুই প্রতিবেশী দেশ নিজেদের সীমান্ত নির্ধারণ করে। ৮১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমার কিছু অংশ নিয়ে উভয়পক্ষের মধ্যে দ্বিমত রয়ে যায় এবং সে অংশকে কেন্দ্র করে বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। এবারের যুদ্ধবিরতিটি 'আসিয়ান' জোটের পর্যবেক্ষক দলের পাশাপাশি দুই দেশের সমন্বয়ের মাধ্যমে তদারকি করা হবে। থাই প্রতিরক্ষামন্ত্রী নাথাপন সাংবাদিকদের বলেন, নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য দুই দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানদের মধ্যে হটলাইন ব্যবস্থা চালু থাকবে।'

আনোয়ার বা ট্রাম্প দুই পক্ষকে নতুন কোনো চুক্তিতে আনতে পারছিলেন না।

অবশেষে কুয়ালালামপুরে আসিয়ান পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বিশেষ বৈঠকে এবং তিন দিনের সীমান্ত আলোচনার পর যুদ্ধবিরতি সম্ভব হয়। চুক্তি অনুযায়ী পরবর্তী ৭২ ঘণ্টা যুদ্ধবিরতি পূর্ণভাবে বজায় থাকেবে, জুলাইয়ের লড়াইয়ে আটক হওয়া ১৮ জন কম্বোডীয় সেনাকে ফেরত দিবে থাইল্যাণ্ড। থাইল্যাণ্ডের এয়ার চিফ মার্শাল প্রপাস সনজাইদি বলেন, 'যুদ্ধ বা সংঘর্ষ মানুষের জন্য সুখবর নয়। বলতে চাই যে, থাইল্যাণ্ড এবং কম্বোডিয়ার মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব নেই।'

সীমান্তে সংঘর্ষ অবসানে আলোচনায় সম্মত

থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে সহিংসতা বন্ধে নেতাদের চাপের মধ্যে কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠকে বসতে রাজি হয়েছেন। যুদ্ধবিরতি রক্ষার চেষ্টায় কুয়ালালামপুরে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক শেষে থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিহাসাফ ফুয়াংকেটকেও জানান, থাইল্যাণ্ডের চান্তানুরিতে দ্বিপক্ষীয় সীমান্ত কমিটির আওতায় এই বৈঠক হবে।

জুলাইয়ে সীমান্ত সংঘর্ষ শুরুর পর আসিয়ানের সভাপতি মালয়েশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় প্রথম যুদ্ধবিরতি হয়েছিল। সেটি পরে ভেঙ্গে পড়ে। মালয়েশিয়ায় বৈঠক শেষ হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভিযোগ, থাই সামরিক বাহিনী সিয়েম রিয়াপ ও প্রেহ ভিহেয়ার প্রদেশে যুদ্ধ বিমানে বোমা হামলা চালিয়েছে। জবাবে থাইল্যাণ্ডের সেনাবাহিনী জানায়, কম্বোডিয়া থাইল্যাণ্ডের ভূ-খণ্ডে

ডজন খানেক রকেট ছুঁড়েছে, যার প্রতিক্রিয়ায় ব্যাংককের বিমানবাহিনী কম্বোডিয়ার দুটি-সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা চালায়। যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে পড়ার পর ৮১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ-স্থলসীমান্তজুড়ে প্রতিদিনই রকেট ও বোমা বর্ষণ ঘটছে।

এই সংঘর্ষ লাওসের কাছের বনাঞ্চল থেকে শুরু করে থাইল্যাণ্ড উপসাগরের উপকূলীয় প্রদেশগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত। সীমান্তে গোলাগুলি চললেও কম্বোডিয়ার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, থাই পক্ষ যুদ্ধবিরতি কার্যকরে আন্তরিকতা দেখাবে এ বিষয়ে তারা আশাবাদী।

থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিহাসাক বলেন, আসন্ন বৈঠক থেকে যুদ্ধবিরতি না-ও আসতে পারে।

অবস্থান হলো, যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মাধ্যমে আসে না, কার্যক্রমের মাধ্যমেই বাস্তবায়ন হয়।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দুই দেশের সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিরতির বাস্তবায়ন; পদক্ষেপ যাচাই প্রক্রিয়া বিস্তারিত আলোচনা করবে।

আসিয়ান জুলাইয়ে হওয়া যুদ্ধবিরতির চুক্তি পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করছে। থাইল্যাণ্ড-কম্বোডিয়া সীমান্তে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। শুরু হওয়া এই সংঘর্ষ আসিয়ানের প্রচেষ্টাকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে। কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ করে, থাইল্যাণ্ড তাদের বামতেয় মিয়াঞ্চে প্রদেশে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান মোতায়েন করে চারটি বোমা ছুঁড়েছে।

আসিয়ানের আলোচনার মধ্যেই সীমান্তে সংঘাত

মালয়েশিয়ায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা যখন থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়ার প্রাণঘাতী সংঘাতের সমাধান খুঁজছেন তখন প্রতিবেশী দেশ দুটির সীমান্তে লড়াই শুরু হয়েছে। এ লড়াই অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথইস্ট এশিয়ান ন্যাশনস (আসিয়ান) এর যুদ্ধবিরতি চুক্তি পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগকে দুর্বল করে দিচ্ছে। জুলাইতে মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের উদ্যোগে থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে চুক্তি হয়েছিল।

৮ ডিসেম্বর থেকে যুদ্ধবিরতি ভেঙ্গে দু'পক্ষ লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ে। তারপর এ সংঘাতে উভয়পক্ষের ৪০ জন নিহত ও ১০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় থাইল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে এফ-১৬ যুদ্ধবিমান মোতায়েন, বানতেই মিয়াংচেই প্রদেশে চারটি-বোমা ফেলার ও গ্রে চান গ্রামে 'বিষাক্ত গ্যাস' ছোঁড়ার অভিযোগ জানিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বার্তা সংস্থা আজঁস কাম্পুচিয়া প্রেস।

মন্ত্রণালয়টি জানিয়েছে, কম্বোডিয়া বাহিনী পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ভিডিওতে দেখা গেছে, বোমা হামলা থেকে বাঁচতে বাসিন্দারা এক জায়গায় জড়ো হয়েছে। শিশুরা কাঁদছে। কম্বোডিয়ার গণমাধ্যমগুলো সেনাবাহিনীকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, বাটামবাং প্রদেশের বেশ কয়েক এলাকায় ভারী কামান থেকে গোলাবর্ষণ করা হয়েছে, তাতে একজন বেসামরিক ব্যক্তি আহত হয়েছেন।

থাইল্যাণ্ডের মর্নিং নিউজ টেলিভিশন থ্রি জানায়, ২২ ডিসেম্বর ভোরে সাকায়েও প্রদেশে 'গুলি বিনিময়ও হয়েছে, কম্বোডিয়ার সেনারা 'ভারী অস্ত্র' থেকে গোলা ছুঁড়েছে। এতে খোক সুং জেলায় আগুন ধরে যায় ও ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই লড়াই নিয়ে থাইল্যাণ্ড সরকার মন্তব্য করেনি।

২২ ডিসেম্বর ভোররাতে কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন মানেতের দপ্তর এক ঘোষণায় জানায়, ২১ জিসম্বর সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলোর পাঁচ লাখ ২৫ হাজার বেসামরিক ব্যক্তি বাস্তুচ্যুত হয়। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ওদোর সিনচে এলাকায় এক বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। থাই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তাদের সীমান্ত অঞ্চলগুলোর চার লাখ বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

কুয়ালালামপুরে আসিয়ানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়ার প্রতিনিধিরাও অংশ নিয়েছিলেন। সংঘাত শুরু হওয়ার পর এটি তাদের প্রথম বৈঠক। আগের দিনে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর উভয়কে 'শত্রুতা থামানো' ভারী অস্ত্র প্রত্যাহার, মাইন বসানো বন্ধ ও কুয়ালালামপুর শান্তি চুক্তি কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। মালয়েশিয়ার প্রধান মন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, শান্তি প্রতিষ্ঠায় উভয় পক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করাই মূল দায়িত্ব। কম্বোডিয়া জানিয়েছে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সুপ্রতিবেশী সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠাই লক্ষ্য। থাইল্যাণ্ড বলেছে, আলোচনার আগে কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকে বাস্তব ও টেকসই যুদ্ধবিরতির ঘোষণা প্রয়োজন। সংঘাত নিরসনে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাচ্ছে। চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র লিন জিয়ান ব্রিফিংয়ে বলেন, এই ডিসেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তারা নিজস্ব উপায়ে মধ্যস্থতা করে আসছেন। তিনি বলেন, বেইজিং যথাসময়ে মধ্যস্থতার তথ্য প্রকাশ করবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও আশা করেছেন, নতুন একটি যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছানো সম্ভব হবে। চীন জানিয়েছে, কম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যে সংলাপ এগিয়ে নিতে তারা ভূমিকা অব্যাহত রাখবেন। ১৯৬৭ সালে আসিয়ান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে আশিয়ান সদস্য দেশগুলার মধ্যে এই সংঘাত সবচেয়ে খারাপ। এটি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থতা ব্লকের বিশ্বাসযোগ্যতার জন্য একটি গুরুতর আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে।

সংঘাতে নিহতের সংখ্যা ৪০

থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়া সীমান্তে চলমান সংগর্ষে অসংখ্য স্কুল বন্ধ। এই সংখাতে ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুত কয়েক লাখ মানুষ।

কম্বোডিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, লড়াইয়ের জেরে ছয়টি প্রদেশের এক হাজার ৩৯টি স্কুল বন্ধ হয়েছে।

সংবাদ মাধ্যম ফ্রেশ নিউজের মতে, এতে ৯ হাজার ৭৯৭ জন শিক্ষক এবং দুই লাখ ৪২ হাজার ৮৮১ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ব্যাহত হচ্ছে।

দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন করে আরো দুই বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। দেশটিতে বেসামরিক নাগরিক নিহতের সংখ্যা ১৫ জনে দাঁড়িয়েছে। আহত হয়েছেন ৭৩ জন। রাষ্ট্রীয় কাম্পুচিয়া প্রেসের খবরে বলা হয়েছে, থাই এফ-১৬ বিমান কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডের ভেতরে হামলা চালিয়েছে।

থাই এনকোয়ারারের খবর অনুযায়ী, থাইল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নিকর্নেদজ বালাঙ্কুরা জানিয়েছেন, ব্যাংকক মানবাধিকার বিষয়ক দফতরে আবেদন জানিয়েছে। থাইল্যাণ্ডে ৯ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন এবং ছয় শতাধিক স্কুল ও হাসপাতাল

বন্ধ বন্ধ রাখা হয়েছে। থাই বিমান বাহিনী কম্বোডিয়ার সামরিক অবস্থানে এফ-১৬ হামলা চালানোরও নিশ্চিত করেছে এবং সীমান্ত অঞ্চলে লড়াই অব্যাহত রয়েছে।

সংঘাত বৃদ্ধির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে চীন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জানান, তারা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন। বেইজিংয়ে তিনি বলেন, 'উভয় পক্ষের হতাহতের ঘটনায় আমরা গভীরভাবে শোকাহত এবং সহানুভূতি প্রকাশ করছি। কম্বোডিয়া ও থাইল্যাণ্ড প্রতিবেশী এবং ভবিষ্যতেও তা থাকবে। একটি দেশের জন্য বন্ধুত্ব ও প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক অমূল্য। সবচেয়ে জরুরি হলো লড়াই থামানো এবং বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া।

তিনি বলেন, আশা করি, উভয় পক্ষ সীমান্ত এলাতার শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষায় সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে। যুদ্ধবিরতি কার্যকর এবং পরিস্থিতি দ্রুত প্রশমিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

কর্মকর্তা ও সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছেন, লড়াই তীব্র হওয়ার পর থেকে সীমান্তের উভয় পাশে প্রায় ৭ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। কম্বোডিয়ায় ১৫ জন বেসামরিক নাগরিক এবং থাইল্যাণ্ডে ১৬ জন সেনা ও ৯ জন বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, থাইল্যাণ্ড ও কম্বোডিয়ার নেতারা শুরু হওয়া লড়াই থামাতে নতুন করে সম্মত হয়েছেন।

কম্বোডিয়া সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ

থাইল্যাণ্ডের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় ট্রাট প্রদেশে কারফিউ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। কম্বোডিয়ার সাথে সীমান্তবর্তী এলাকায় সংঘর্ষ উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ায় এই পদক্ষেপ। সীমান্তে গোলাগুলি ও সংঘর্ষে প্রাণহানি ঘটেছে, যা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রাতে চলাচল নিয়ন্ত্রণে রাখতে কারফিউ কার্যকর করা হয়েছে। প্রশাসন বলছে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সেনা বাড়ানো হয়েছে।

সংঘর্ষে কয়েকজন সেনা নিহত হয়েছেন। থাই সেনাবাহিনী সৈন্যদের লাশ জাতীয় পতাকায় মোড়ানো অবস্থায় নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় দেশজুড়ে শোক তৈরি হয়েছে। কম্বোডিয়ার পক্ষ থেকেও হতাহতের খবর পাওয়া গেছে, যদিও সঠিক সংখ্যা নিশ্চিত করা যায়নি।

বিষয় হলো, মাত্র দুই দিন আগে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প মধ্যস্থতার চেষ্টা করে জানিয়েছিলেন, দুই দেশ যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে। বাস্তবে সংঘর্ষ আরো বিস্তৃত হয়েছে এবং উপকূলীয় অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্লেষকরা বলছেন, সীমান্তবিরোধ দীর্ঘদিনের হলেও সাম্প্রতিক উত্তেজনা পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে।

আন্তর্জাতিক মহল, বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক সংগঠনগুলো, দ্রুত শান্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানিয়েছে। সীমান্তে সংঘর্ষে বাণিজ্য ও মানুষের চলাচল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। জনগণ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছে, দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ হলে জীবিকা ও নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে।

থাইল্যাণ্ড সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। সীমান্ত বিরোধ সমাধানে কূটনৈতিক উদ্যোগ ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

থাইল্যাণ্ডের রাজধানী ব্যাংকক ছাড়াও চিয়াংমাই, কাঞ্চনবুরি, পাতাইয়া ইত্যাদি আমাদের কাছে পরিচিত। থাইল্যান্ড রিসোর্টের জন্য বিখ্যাত। থাইল্যাণ্ডের রাজার নাম লংকর্ন। তার মা সম্প্রতি মারা গেছেন। থাইল্যান্ডের পরলোকগত বাবা ছিলেন একজন কৃষিবিদ। ব্যাংককের বিমান বন্দর থেকে শহর পর্যন্ত রাস্তার দু'পাশের গাছের সারি অনেককেই আকৃষ্ট করে। থাইল্যাণ্ডে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন থাকার পরও অব্যাহত উন্নতি হয়েছে এবং শক্তিশালী অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দেশটির মুসলিম প্রধান তিনিট জেলা মালয়েশিয়ার সীমান্তের কাছে অবস্থিত। থাইল্যাণ্ডের সেনাবাহিনীর প্রধান একজন মুসলিম ছিলেন। তার নাম সোন্‌থি বুনিয়ারাত গ্লিন। বাংলাদেশের মানুষ অধিকাংশ মুসলমান বলে এই প্রসঙ্গটি আনতে হলো।

দুই দেশের সাথে বাংলাদেশোর সম্পর্ক ভাল হওয়াতে দুই দেশের সংঘাতের প্রভাব বাংলাদেশের উপরও পড়তে পারে। কম্বোডিয়াতে কয়েক হাজার মুসলমান বসবাস করে এবং প্রতি বছর হজ্জও পালন করে। কম্বোডিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ভাল।

১৯৬৭ সালের পর থেকে আসিয়ান' জোটভুক্ত দেশ থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মাঝে সীমান্ত সংঘাত বাঁধেনি। অতএব, এটা এই জোটের জন্যও একটি সমস্যা। ■

দৃষ্টি আকর্ষণ

সম্মানিত ক্রেতাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, পবিত্র মাহে রামাদান এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আগামী ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের বইগুলো নিজস্ব বিক্রয় কেন্দ্রে পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে বিক্রয় করা হবে।

ডাক ও কুরিয়ারযোগে দেশের যে কোন জেলায় বই পাঠানো হয়।

বিক্রয় কেন্দ্র :

বাংলা বাজার ঃ ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, দোকান নং-১৫ (নীচতলা), ঢাকা। ০১৭৪১-৬৭৭৩৯৯

কাঁটাবন ঃ কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ রোযা ভঙ্গের কারণগুলো কি কি?

আশরাফুল ইসলাম, হালিশহর, চট্টগ্রাম

উত্তর ঃ

নিম্নোক্ত যে কোন কারণ দেখা গেলে রোযা বা সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে :

১. ইচ্ছা পূর্বক পানাহার ও ধুমপান করা।

২. স্বেচ্ছায় বমি করা

৩. স্বামী-স্ত্রীর মিলন

৪. বৈধ অবৈধ যে কোন প্রকার যৌনক্রিয়া।

৫. পানাহারের বিকল্প কিছু গ্রহণ করা, যেমন- ইনজেকশান বা রক্ত গ্রহণ করা। আর তা এমন ইনজেকশান যার মাধ্যমে খাবার সরবরাহ করা হয়।

৬. মাসিক স্রাব ও প্রসবোত্তর স্রাব

প্রশ্ন-২ ঃ কেউ যদি ভুলক্রমে কিছু খেয়ে ফেলে তবে কি তার সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে?

মাহমুদুল হাসান, বড়ুরা, কুমিল্লা

উত্তর ঃ না, ভুলক্রমে কোনো রোযাদার কিছু খেয়ে ফেললে তার রোজা ভাঙ্গবে না।

এব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

"যদি কেউ ভুলক্রমে পানাহার করে তবে সে যেন তার সিয়াম পূর্ণ করে নেয়, কেননা আল্লাহ তা'আলাই তাকে এ পানাহার করিয়েছেন (অর্থাৎ এতে তার রোযা ভাঙ্গেনি)।" (বুখারী: ১৯৩৩; মুসলিম: ১১৫৫)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন,

مَنْ أَفْطَرَ فِيْ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلاَ كَفَّارَةَ

"যে ব্যক্তি ভুল বশতঃ রমাযানের দিনের বেলায় কিছু খেয়ে ফেলল : সেজন্য কোন কাযা ও কাফফারা দিতে হবে না।" (দারাকুতনী: ২৪; বায়হাকী: ৭৮৬৩)

প্রশ্ন-৩ ঃ অযু বা গোসলের সময় অসাবধানতা বশতঃ কিছু পানি গলায় ঢুকে গেলে সিয়াম কি ভঙ্গ হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ না, ভঙ্গ হবে না।

এব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

إِنَّ اللهَ وَضعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوْا عَلَيْهِ

"আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মাতের ভুল-ভ্রান্তি ও বাধ্য হয়ে ঘটে যাওয়া পাপরাশি মাফ করে দিবেন। (ইবন মাজা : ২০৪৫)

প্রশ্ন-৪ ঃ যাকাত দেয়া কাদের জন্য ফরয? কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত ফরয হয়?

আবদুল কাদের, মীরপুর, ঢাকা।

উত্তর ঃ চাষাবাদের জমাজমি, বসবাসের ঘর, চলার গাড়ী এবং সোনা-রূপা ব্যতীত অন্যান্য ব্যবহারিক দ্রব্যসামগ্রী, যেমনঃ টিভি, ফ্রিজ, ইত্যাদি ছাড়া যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক, যেমনঃ সাড়ে সাত তোলা সোনা, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর যে কোন একটির মূল্য পরিমাণ নগদ টাকা অথবা কিছু সোনা, কিছু রূপা এবং জমাকৃত কিছু নগদ টাকা বা ব্যবসার মাল মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের হয় এবং তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় এবং তার কোন ঋণ না থাকে, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। ঋণ থাকলে ঋণ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ যদি নিসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে।

প্রশ্ন-৫ ঃ ফিতরা কাদের জন্য বাধ্যতামূলক? ফিতরার পরিমাণ এবং কখন ফিতরা আদায় করতে হবে জানতে চাই।

সুমনা ইসলাম, হালিশহর, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে এসেছে,

عن ابن عمر (رضـ) اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍعَلَى كُلِّ حُرٍّ اَوْعَبْدٍ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ .

ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক মুসলিম স্বাধীন পুরুষ ও মহিলা এবং দাস-দাসী সকলের উপর এক সা' হিসেবে খেজুর বা যব রমযান মাসে সাদকায়ে ফিতর (বা ফিত্‌রা) নির্ধারণ করেছেন। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ যাকাত, অনুচ্ছেদঃ ২, হাদীস নং-২১৪৯)

ফিতরা মূলত রোযার যাকাত। যাকাত যেমন মালকে পবিত্র করে, অনুরূপভাবে ফিত্‌রাও রোযায় যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে তা দূরিভূত করে।

সহীহ মুসলিমে আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে অপর একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তাতে এসেছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জীবদ্দশায় আমরা ছোট-বড়, স্বাধীন নর-নারী ও ক্রীতদাস প্রত্যেকের পক্ষ থেকে এক সা' খাদ্য (অর্থাৎ গম) বা এক সা' পনির বা এক সা' যব বা এক সা' খেজুর বা এক সা' কিশমিশ ফিতরা হিসেবে আদায় করতাম। আমরা এভাবেই ফিতরা আদায় করে আসছিলাম। অবশেষে যখন মু'আবিয়া (রা.) হজ্জ বা 'উমরার উদ্দেশ্যে আমাদের মাঝে আগমন করলেন, তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন এবং বললেন, আমি জানি যে, সিরিয়ার দুই মুদ্দ (অর্ধ সা') লাল গম এক সা' খেজুরের সমান। সুতরাং লোকেরা তাঁর অভিমত গ্রহণ করলো।

এ হাদীসের বিষয়ে আমাদের পর্যালোচনা হলোঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে যে পাঁচটি জিনিস দ্বারা ফিতরা আদায় করা হত, সেগুলো মূল্যমানের দিক থেকে হয়ত সমান বা কাছাকাছি ছিল। আর সিরিয়ার অর্ধ সা' লাল গমের মূল্যমান তখন হয়তো

(মূল্যের দিক দিয়ে) এক সা' খেজুরের সমান বা কাছাকাছি ছিল। হয়তোবা এ কারণে তিনি উপরিউক্ত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। তা ছাড়া তিনি এ কথা বলেননি যে, তোমরা সবাই অর্ধ সা' গম দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করো। বর্তমানে ফিত্‌রার অন্যান্য জিনিসের মূল্যের তুলনায় গমের মূল্য অনেক কম। এমনকি বলতে গেলে আকাশ-যমীন তফাত। তা সত্ত্বেও গম বা আটা দিয়েই ফিত্‌রা দিতে হবে? তাও অর্ধ সা'? তা ছাড়া আমাদের সমাজের লোকদের সবার আর্থিক অবস্থা সমান নয়। কেউ আছেন কোটি কোটি টাকার মালিক, কেউ আছেন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, কেউ আছেন পেটে-ভাতে চলেন। তার পরও সবাই কি অর্ধ সা' গম দিয়ে ফিতরা আদায় করবেন? আল্লাহ যাদেরকে কোটি কোটি ও লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক বানিয়েছেন তারাও যদি অর্ধ সা' গম দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করেন, তাহলে এক সা' কিমমিস, এক সা' পনির দিয়ে কারা ফিত্‌রা আদায় করবে? আল্লাহ যাদেরকে লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি টাকার মালিক বানিয়েছেন, তারা আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ এক সা' কিসমিস বা এক সা' পনির বা তার মূল্য দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করলে কতই না ভালো হয়। একদিকে হাদীস অনুযায়ী 'আমল হয় অপরদিকে ফকীর মিসকীন ও গরীব মানুষগুলোর 'ঈদের আনন্দ কিছুটা হলেও বাড়বে।

ফিত্‌রার পরিমাণ

যেসব জিনিস দ্বারা ফিত্‌রা আদায় করার কথা হাদীসে এসেছে; খেজুর, কিসমিস, পনীর বা যব দিয়ে ফিত্‌রা আদায় করলে প্রতিটা ফিত্‌রার জন্য এক সা' অর্থাৎ আড়াই কেজি মতান্তরে সাড়ে তিন কেজি করে আদায় করতে হবে। অথবা তার মূল্য আদায় করতে হবে। আর গম দিয়ে যারা ফিতরা আদায় করবেন প্রতিটা ফিত্‌রার জন্য এক সা' অথবা অর্ধ সা' অথবা তার মূল্য আদায় করলে আশা করা যায় যে, তাতেও ফিতরা আদায় হয়ে যাবে।

ফিতরা আদায়ের সময়

সাওমের (রোযার) যাকাতকে বাংলাভাষায় বলা হয় ফিতরা। হাদীছের ভাষায় বলা হয় যাকাতুল ফিতর।

ফিতরা বা যাকাতুল ফিতর :

'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

فَرَضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِطُهْرَةً لِّلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفْثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِيْنِ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা ফরয করেছেন সাওম (রোযা) পালনকারীদের অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করা ও মিসকীনদের খাদ্য দেয়ার জন্য। (সুনানু আবু দাউদ, অধ্যায়-যাকাত, অনুচ্ছেদ- সাদাকাতুল ফিতর)

ফিতরা কখন আদায় করতে হবে : ফিতরা আদায় করার সময়ের ব্যাপারে সহীহ মুসলিমে এসেছে:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رض أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَمَرَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

'আবদুল্লাহ ইবন 'উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে 'ঈদুল ফিতরের সালাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়- যাকাত, অনুচ্ছেদ-২, হাদীছ নং-২১৬০)

জামে' আত তিরমিযীতেও অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। (অধ্যায়- যাকাত, হাদীছ নং-৬২৯)

অতএব 'ঈদুল ফিতরের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই ফিতরা আদায় করা উত্তম। এছাড়া রমযানে এমনকি রমযানের পূর্বেও এটি আদায় করার ব্যাপারে ফকীহগণের বিভিন্ন মত পাওয়া যায়।

অনেকের মতে 'ঈদের একদিন বা দুইদিন পূর্বে ফিতরা আদায় করা যায়। ইমাম আবু হানীফা (রহ) এর মতে এটি রমযানের পূর্বেও আদায় করা যাবে। ইমাম শাফে'ঈ (রহ) এর মতে রমাযানের শুরুতেও ফিতরা আদায় করা যাবে। এছাড়াও হাদীছে এসেছে:

من أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

যে ব্যক্তি 'ঈদের সালাতের পূর্বে ফিতরা আদায় করে তার যাকাত (ফিতরা) গ্রহণযোগ্য। আর যে ব্যক্তি 'ঈদের সালাতের পর ফিতরা আদায় করবে তার জন্য সেটা একটা সাধারণ সাদাকা বা দান হিসেবে গণ্য হবে। (দেখুন: সালেহ আল উসাইমীন (র), ফাতওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃ- ৪৮৮-৪৮৯)

অতএব ফিতরা 'ঈদের সালাতের পূর্বেই আদায় করা কর্তব্য। 'ঈদের সালাতের পরে নয়। কারণ 'ঈদের সালাতের পরে ফিতরা আদায় করলে সেটা সাধারণ দান হিসেবে গণ্য হবে।

প্রশ্ন-৬ ঃ লাইলাতুল কদর কি রমাযানের শেষ দশকের বেজোড় রাত্রিতে, নাকি শেষ দশকের যে কোন সময় হতে পারে? জানাবেন।

মারূফ হাসান, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।

উত্তর ঃ মহান রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনের সূরাতুল কাদরে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

"নিশ্চয়ই আমি কুরআন নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে বা কদরের রাতে"।(সূরা আল কাদর:১)

আর একথাও সুস্পষ্ট যে, লাইলাতুল কদর রমযান মাসের শেষ দশকে।

এখন জানার বিষয় হলো, লাইলাতুল কদর রমযান মাসের শেষ দশকের বেজোড় কোন রাতে? নাকি শেষ দশকের যে কোন রাতে? সহীহ আল বুখারীতে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) يُجَاوِرُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُوْلُ تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রমযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করতেন

এবং বলতেন: তোমরা রমযানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর তালাশ করো। (সহীহ আল বুখারী- অধ্যায়: লাইলাতুল কদর এর ফযীলত, হাদীস নং-২০২০)

সহীহ আল বুখারীর অপর একটি হাদীসে এসেছে:

عن عائشة (رضـ) قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَارَهُ وَاَحْيَا لَيْلَهُ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ .

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক আসত তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর লুঙ্গি কষে বাঁধতেন (বেশি বেশি 'ইবাদতের প্রস্তুতি নিতেন) এবং রাত জেগে থাকতেন ও পরিবার পরিজনকে জাগিয়ে দিতেন। (সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২০২৪)

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত সহীহ আল বুখারীর অপর একটি হাদীসে এসেছে:

ان رسول الله (ﷺ) قال : تَحَرُّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِى الْوِتْرِمِنَ الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ .

রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :

"তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদর বা কদরের রাতের অনুসন্ধান করো। (সহীহ আল বুখারী, প্রাগুক্ত, হাদীস নং- ২০১৭)

এই হাদীসটি সহীহ মুসলিমসহ আরো অন্যান্য হাদীসের কিতাবেও বর্ণিত হয়েছে।

সারকথা হলো, কদরের রাত রমযানের শেষ দশকের বেজোড় কোনো রাত, যেমন: ২১, ২৩, ২৫, ২৭ ও ২৯ তম রাত হওয়ার কথাই হাদীসে এসেছে।

অতএব, কদরের রাত লাভ করতে যারা আগ্রহী তাদের রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতেই কদর তালাশ করলে আশা করা যায় ইনশা আল্লাহ কদরের রাত পাওয়া যাবে। তবে শেষ দশকের সব রাত জাগলে বা শেষ দশকে ই'তিকাফ করলে লাইলাতুল কদর পাওয়া আরো বেশী নিশ্চিত হওয়া যায়।

প্রশ্ন-৭ ঃ লাইলাতুল কাদরের ফযীলত জানতে চাই।

সালেহ আহমেদ

রামপুরা, ঢাকা।

উত্তর ঃ লাইলাতুল কাদরের ফযীলত মহান রাব্বুল আ'লামীন নেহায়েত প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় সূরা আল কাদর এ বর্ণনা করেছেন। তাফসীরসহ সূরা আল কাদর অধ্যয়ন করলে লাইলাতুল কাদর এর ফযীলত জানা যাবে।

এখানে আমরা সূরা আল-কাদর থেকে অতি সংক্ষেপে লাইলাতুল কাদর এর ফযীলত বর্ণনা করার চেষ্টা করবো।

সূরা কাদর এর প্রথম আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

"আমি কদরের রাতে কুরআন নাযিল করেছি।" আল কুরআন মহান আল্লাহর মহান বাণী যার তুলনা আসমানের নীচে এবং যমীনের উপরে কোন কিছুতেই নেই। মহান আল্লাহর এ মহান বাণী লাইলাতুল কাদরে নাযিল করে এ রাতকে মহিমান্বিত করেছেন।

পরবর্তী আয়াত:

وَ مَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ .

"তুমি কি জান কদরের রাত কি?" এ কথা বলে বুঝানো হয়েছে, লাইলাতুল কাদর অন্যান্য রাতের মত সাধারণ কোনো রাত নয় বরং এ রাতটি হলো অত্যন্ত মহিমান্বিত ও মহান রাত। পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ .

কদরের রাতটি হলো হাজার মাসের চাইতেও উত্তম। আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য خير এর চাইতে উপযোগী আর কোন শব্দ নেই। অনুরূপভাবে আধিক্য বুঝানোর জন্য الف (হাজার) ছাড়া বা الف এর অধিক আর কোন শব্দ ব্যবহার হয় না। কদরের রাতের মর্যাদা বুঝাতে আল্লাহ তা'আলা خَيْر ও اَلْف শব্দ ব্যবহার করে বুঝিয়েছেন এর মর্যাদা অসীম ও অনেক বেশী।

অতএব, কদরের রাতের যে কত মর্যাদা তা মহান আল্লাহ-ই ভালো জানেন। এর পরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ .

"ফেরেশতাগণ ও রূহ (জিবরীল আ.) এই রাতে তাদের রবের অনুমতিক্রমে সব হুকুম নিয়ে অবতীর্ণ হয়।" এ আয়াতটিতেও কদরের রাতের ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ রাতে জিব্রীল (আ.) সহ অসংখ্য ও অগনীত ফেরেশতা সারা বছরের অবধারিত ঘটনাবলী নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ .

এই রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরিকৃত হয়। (৪৪ : সূরা আদ দুখান, আয়াত-৪)

এ আয়াতে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, এ পবিত্র রাতে তাকদীর সংক্রান্ত সব ফয়সালা লিপিবদ্ধ করা হয়। অর্থাৎ এ বছর যেসব বিষয় প্রয়োগ করা হবে সেগুলো লাওহে মাহফূয থেকে নকল করে ফেরেশতাগণের কাছে সোপর্দ করা হয়। (ইমাম নববী - শরহে সহীহ মুসলিম: ৮/৫৭)

প্রশ্ন-৮ ঃ ই'তিকাফ এর অর্থ কী বা ই'তিকাফ কাকে বলে? ই'তিকাফ কত প্রকার ও কী কী? ই'তিকাফের নিয়ম জানতে চাই। ই'তিকাফ কি সবার জন্য জরুরী?

মনির হোসেন, বগুড়া

উত্তর ঃ ই'তিকাফ অর্থ কোনো স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকা। শরী'আতের পরিভাষায় ই'তিকাফ: মাহে রমযানের শেষ দশ দিন অথবা অন্য কোনো দিন দুনিয়ার কাজকর্ম ত্যাগ করে পরিবার পরিজন থেকে আলাদা হয়ে 'ইবাদাতের উদ্দেশ্যে মাসজিদে অবস্থান করার নাম ই'তিকাফ। অথবা এভাবেও বলা যায়, মসজিদে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অবিরাম অবস্থান করা।

শরী'আতের দৃষ্টিতে ই'তিকাফ:

উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, ই'তিকাফ শরী'আত সম্মত ও সুন্নাত। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযানে দশদিন (অর্থাৎ রমযানের শেষ দশক) ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেছেন সে বছর বিশ দিনই ই'তিকাফ করেছেন। সহীহ আল বুখারীতে এসেছে-

عن ابى هريرة قال: كان النبى (ﷺ) يَعْتَكِفُ فِىْ كُلِّ رَمَضَان عَشْرَةَ اَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِىْ قُبِضَ فِيْهِ اِعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ يَوْمًا .

"আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি রমযানে দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। যে বছর তিনি ইন্তিকাল করেছেন, সে বছর তিনি বিশ দিন ই'তিকাফ করেছিলেন। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: ই'তিকাফ, অনুচ্ছেদ: রমযানের মধ্যম দশক ই'তিকাফ করা, হাদীস নং- ২০৪৪)

ই'তিকাফের প্রকারভেদ:

ই'তিকাফ দু'প্রকার: সুন্নাত ও ওয়াজিব।

যে ই'তিকাফ একজন মুসলিম নিজের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী আল্লাহর নৈকট্য লাভ, সাওয়াব অর্জন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুকরণ ও অনুসরণের উদ্দেশ্যে করে, সেটাই সুন্নাত ই'তিকাফ। সুন্নাত ই'তিকাফ রমযানের শেষ দশ দিনে করাটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পক্ষান্তরে যে ই'তিকাফ কোন ব্যক্তি নিজের উপর ওয়াজিবরূপে আরোপ করে নেয়। যেমন: কেউ শর্তহীনভাবে এই বলে মানত করলো যে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আমি এত দিন ই'তিকাফ করবো। অথবা শর্তযুক্তভাবে এই বলে মানত করলো যে, আমার রোগীকে যদি আল্লাহ আরোগ্য দান করেন, অথবা আল্লাহ যদি আমার এই বিপদ দূর করে দেন, তবে আমি এতদিন বা এত সময় ই'তিকাফ করবো। সহীহ আল বুখারীতে এসেছে:

عن ابن عُمَرَ (رضـ) ان عُمَرَ قَالَ يَارَسُوْلَ اِنى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ ان اَعْتَكِفُ لَيَلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ اَوْفِ بِنَذَرِكَ .

ইবন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। 'উমার (রা.) একবার বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমি জাহেলী যুগে মানত করেছিলাম, মাসজিদে হারামে এক রাত ই'তিকাফ করবো। তিনি বললেন, তুমি তোমার মানত পূর্ণ করো। (সহীহ আল বুখারী, অধ্যায়: শপথ ও মানত, হাদীস নং- ৬৬৯৭)

ই'তিকাফের নিয়ম:

আমাদের দেশে সাধারণত রমযানের শেষ দশকেই লোকেরা ই'তিকাফ করে থাকেন। এটা মূলত সুন্নাত ই'তিকাফ। এই ই'তিকাফের নিয়ম হলো: বিশ রমযান সূর্যাস্তের পূর্বেই 'ইবাদাত বন্দেগী করার উদ্দেশ্যে ই'তিকাফের নিয়তে মাসজিদে প্রবেশ করা এবং শাওয়ালের চাঁদ উঠা পর্যন্ত অবিরাম মসজিদে অবস্থান করে বেশী বেশী সালাত আদায়,

কুরআন তিলাওয়াত, তাসবীহ তাহলীল যিকর-আযকার ইত্যাদি করতে থাকা এবং আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলে কায়মনোবাক্যে দু'আ ও প্রার্থনা করতে থাকা। এই ই'তিকাফ সুন্নাত। ফরয ও ওয়াজিবের মত জরুরী নয়। তবে গুনাহ মাফ ও আল্লাহর দরবারে জাহান্নাম থেকে মুক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করা, পরকালীন সফলতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা, এবং লাইলাতুল কদরের মহান মর্যাদা লাভ করতে চাইলে একথা বলতেই হবে, ই'তিকাফের বিকল্প নেই। অতএব, লাইলাতুল কদরের মহান মর্যাদা লাভে সবারই সচেষ্ট হওয়া চাই।

প্রশ্ন-৯ ঃ জামা'আতের জন্য ইকামাত হয়ে গেলে এ সময় নফল বা অন্য নামায পড়া যাবে কি না, জানালে উপকৃত হব?

মোঃ খলিলুর রহমান
কিশোরগঞ্জ

উত্তরঃ জামা'আত শুরু হয়ে গেলে নফল নামায পড়া মাকরূহ। কেননা আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "যখন জামা'আত শুরু হয়ে যায়, তখন ফরয নামায ছাড়া আর কোনো নামায নেই।" অন্য রেওয়ায়াতে : যে নামায শুরু হয়েছে, তা ছাড়া আর কোনো নামায নেই। -আহমদ, মুসলিম, সুনানে আরবায়া। আর আবদুল্লাহ বলেন: এক ব্যক্তি মসজিদে ঢুকলো। রাসূলুল্লাহ (সা.) তখন ফজরের নামায পড়ছেন। সে মসজিদের এক পাশে দু'রাকাত সুন্নত পড়ে নিলো। তারপর রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে জামা'আতে শরিক হলো। যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) সালাম ফেরালেন, তাকে বললেন : হে অমুক, তুমি দুই নামাযের কোনটির প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ? তোমার একাকী নামাযের জন্য, নাকি আমাদের সাথের নামাযের জন্য?- মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী। একাকী পড়া নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) অসন্তোষও প্রকাশ করলেন, আবার তা পুনরায় পড়তেও আদেশ করলেন না– এ দ্বারা প্রমাণিত হয়, ঐ নামায মাকরূহ হলেও বৈধ।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন : আমি নামায পড়ছিলাম। এই সময় মুয়াযযিন ইকামত দেয়া শুরু করলো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে টান দিয়ে বললেন: তুমি কি ফজরের নামায চার রাকাত পড়ছ?- বায়হাকি। আর আবু মূসা থেকে বর্ণিত : রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে ফজরের দু'রাকাত পড়তে দেখলেন। তখন মুয়াযযিন আযান দিতে শুরু করলো। তখন তার ঘাড় টিপে বললেন : এটা ছিলো এটার আগে। (অর্থাৎ এ নামাযটা আযানের আগে পড়া উচিত ছিলো।) (সাইয়্যেদ সাবেক, ফিক্হুস্ সুন্নাহ্, শতাব্দী প্রকাশনী , ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৭।) ■

ফতোয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত বই পড়ুন, জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

পবিত্র মাহে রামাযান এবং ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে বিশেষ কমিশনে বই কিনুন!

এই অফার চলবে ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত

পাইকারী ৪২% এবং খুচরা ৩৫% কমিশনে ক্রয় করুন

নং	বইয়ের নাম	লেখক	মূল্য
১	দারসুল কুরআন সংকলন-১-২	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৪৫/-
২	দারসুল কোরআন সিরিজ-১-৩	প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ	৪১০/
৩	দারসুল হাদীস সিরিজ-১-৩	ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভুঁইয়া	৪৬০/-
৪	কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা	খুররম মুরাদ	১৭০/-
৫	আল কুরআন এক মহাবিস্ময়	ড. মরিস বুকাইলি	১০০/-
৬	সাহীহ্ আল্ বুখারী ১-৫	ইমাম বুখারী (রহ)	২৭৭০/-
৭	সহীহ মুসলিম ১-৮	ইমাম মুসলিম (র)	৪১২০/
৮	জামে আত-তিরমিযী ১-৬	ইমাম তিরমিযী (র)	২৩৯০/-
৯	সুনান আবু দাউদ ১-৬	ইমাম আবূ দাউদ (র)	২২৮০/-
১০	সুনান আন-নাসাঈ ১-৬	ইমাম নাসাঈ (র)	২২৬০/-
১১	মুসনাদে আহমাদ (১)	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)	৩৫০/
১২	রিয়াদুস সালেহীন ১-৪	ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)	১৩৩০/-
১৩	শু'আবুল ঈমান	ইমাম বাইহাকী (র)	১২০/-
১৪	সীরাতে ইবনে হিশাম	আকরাম ফারুক অনূদিত	৪৫০/-
১৫	আবু বাকর আছ্ছিদ্দিক (রা)	ড. আহমদ আলী	৭৫০/-
১৬	উসমান ইবনু আফ্ফান (রা)	ড. যুবাইর মুহাম্মাদ এহসানুল হক	৩৫০/-
১৭	আসহাবে রাসূলের জীবনকথা ১-৭	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	২৩৪০/-
১৮	তাবি'ঈদের জীবনকথা ১-৪	ড. মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ	১৩৮০/-
১৯	ইসলামী জাগরণের তিন পথিকৃৎ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	১৮০/-
২০	ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ধারণা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১৬০/-
২১	কবিরা গুনাহ	ইমাম আয যাহাবী (র)	১৮০/-
২২	আমরা সেই সে জাতি (১-৩)	আবুল আসাদ	৩৯০/-
২৩	বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস	আব্বাস আলী খান	৪২০/-
২৪	আল আকসা মসজিদের ইতিকথা	এ এন এম সিরাজুল ইসলাম	৮০/-
২৫	উসমানী খিলাফাতের ইতিকথা	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭৫/-
২৬	মুসলিম নারীর হিজাব ও সালাতে তার পোষাক	শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ (র)	৬০/-

২৭	ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী	ড. মুসতাফা আস্ সিবায়ী	১৪০/-
২৮	নারী অধিকার পর্দা ও নারী পুরুষে মুসাফাহা	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১০০/-
২৯	পর্দার আসল রূপ	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৩০	দি সোর্ড অব আল্লাহ	লে. জেনারেল এ.আই. আকরাম (অব.)	৩৫০/-
৩১	দৈনন্দিন জীবনে তাকওয়া	ড. মুহাম্মাদ ছাইদুল হক	১৪০/-
৩২	মদিনা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	২০০/-
৩৩	মক্কা মুনাওয়ারার ইতিকথা	এ. এন. এম. সিরাজুল ইসলাম	৬০০/-
৩৪	ইবনুল কায়্যিম (রহ)	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	৪৪০/-
৩৫	আদর্শ মানব মুহাম্মাদ (সা)	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৩৬	আল্লাহর দিকে আহ্বান	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৪০/-
৩৭	ইসলামী নেতৃত্ব	এ. কে. এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৩৮	রাসূলুল্লাহ (সা)-এর পঠিত দু'আ	ইমাম ইবনে কাইয়েম (র)	১৩০/-
৩৯	ইসলামী ব্যাংকিং : বৈশিষ্ট ও কর্মপদ্ধতি	শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪০	সুদ	শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান	৬০/-
৪১	আপনাদের প্রশ্নের জওয়াব (১-৩)	আল্লামা ইউসুফ লুধিয়ানাবী (র)	৪২০/-
৪২	আল্লাহর পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৩০/-
৪৩	সফল জীবনের পরিচয়	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৭০/-
৪৪	রাসূলুল্লাহর শিক্ষাদান পদ্ধতি	ড. মুহাম্মাদ আবদুল মাবুদ	৪০০/-
৪৫	ইসলামের দৃষ্টিতে পোষাক পর্দা ও সাজসজ্জা	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৬	তাযকিয়াতুন নাফস	ড. আহমদ আলী	৩০০/-
৪৭	ইসলামের শাস্তি আইন	ড. আহমদ আলী	৪০০/-
৪৮	ইসলামের দৃষ্টিতে সমাজ সেবা ও সংস্কার	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	২২০/-
৪৯	মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	অধ্যাপক মাযহারুল ইসলাম	৩৫/-
৫০	আল্লাহর হক মানুষের হক	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৫০/-
৫১	ইলমুল ফিকহ ঃ সূচনা ও ক্রমবিকাশ	ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক	৪০০/-
৫২	ইমাম বুখারী (রহ.) জীবনি ও হাদীস চর্চা	ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন	৪০০/-
৫৩	নামায কায়েম কর	অধ্যাপক মোশাররফ হোসাইন	৩০/-
৫৪	রোযার তাৎপর্য ও বিধিবিধান	ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী	১১০/-
৫৫	গবেষণাপত্র সংকলন (১-২৫)	সংকলিত	২১৯৫/-
৫৬	যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন	এ.কে.এম. নাজির আহমদ	৬০/-
৫৭	ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় যাকাত	জাবেদ মুহাম্মাদ	২৬০/-

যোগাযোগ : ৩৪/১ নর্থ ব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট, (নীচতলা)
বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল : ০১৭৪১ ৬৭৭৩৯৯
কাঁটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা। মোবাইল : ০১৬১২-৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০
E-mail : dhakabic@gmail.com, web : www.dhakabic.com

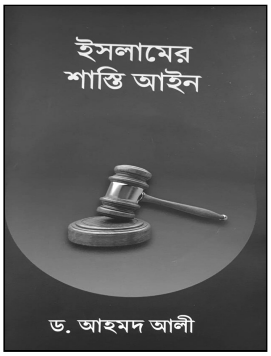

বই পরিচিতি
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বইয়ের নাম : **ইসলামের শাস্তি আইন**
লেখক : **ড. আহমদ আলী**
পৃষ্ঠা : ৩৬০
মূল্য : ৪০০ টাকা
প্রকাশক: ডঃ মুহাম্মদ সামিউল হক ফারুকী
প্রকাশনায়: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমদ আলী একজন স্বনামধন্য উচ্চ মানের গবেষক। তাঁর বেশিরভাগ গ্রন্থই গবেষণার ফসল। ইসলামী আইন, বিচার, শাস্তি, শিরক, বিদ'আত, তুলনামূলক ফিক্‌হ, কী নেই তার গবেষণায়।

পৃথিবীর সভ্য সমাজে ও বিভিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিতে কিছু অপরাধ সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু পার্থক্য হচ্ছে সেসব অপরাধের শাস্তি ও শাস্তির মাত্রা নিয়ে।

আবার কিছু অপরাধ, অপরাধ হিসেবে গণ্যই হয় না কোনো কোনো সমাজ ও সভ্যতায়। যেহেতু ইসলাম সার্বজনীন, তাই সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ইসলাম ও ইসলামী আইনের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শাস্তি আইন সমূহ। ইসলামের শাস্তি আইন একটি বাস্তবসম্মত আইন। অপরাধ দমনে এই আইনের কোন বিকল্প নেই। যারা ইসলামী আইন, বিচার ও শাস্তি সমূহ নিয়ে অধ্যয়ন করেন তাদের জন্য যেমন এই বইটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে তেমনিভাবে যারা ইসলামকে ও ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে জানতে গভীর আগ্রহ রাখেন তাদের জন্যও বইটি সহায়ক হবে।

যারা ইসলামী সমাজ, রাষ্ট্র বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, বুদ্ধিজীবী মহলে দাওয়াতী কাজের জন্য, তাদের সামনে ইসলামী আইনের বিশেষত্ব তুলে ধরার জন্য এই বইটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামের শাস্তি আইনকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

এক. আল কুরআন ও সুন্নায় নির্দেশিত শাস্তির মাত্রা, যাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় হুদূদ বলা হয়। দুই. হত্যার বদলে হত্যাকারীকে হত্যা করা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করার বদলে নষ্ট কারীর অনুরূপ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নষ্ট করা, যাকে ইসলামী আইনের পরিভাষায় কিসাস বা সদৃশ শাস্তি বলা হয়। তিন. তা'যীর বা সাধারণ দন্ড। এ ধরনের শাস্তির ধরন কুরআন-সুন্নায় নির্দেশ করে দেয়া হয়নি। বিচারকের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

বইটির প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে শাস্তির সংজ্ঞা, শাস্তির শ্রেণীবিভাগ, ইসলামী শাস্তি আইনের বৈশিষ্ট্য সমূহ, শাস্তি আইনের উদ্দেশ্য সমূহ যেমন- মানুষের মৌলিক বিষয় সমূহের সংরক্ষণ, সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে পবিত্র করণ। হুদূদের অন্তর্ভুক্ত শাস্তিগুলো হচ্ছে- চুরির শাস্তি, ডাকাতি ও লুটেরার শাস্তি, জবরদখলের শাস্তি, যেনা বা ব্যভিচারের শাস্তি, ব্যভিচারের অপবাদের শাস্তি, মধ্যপান বা মাদক দ্রব্য সেবনের শাস্তি, ইসলাম ধর্ম ত্যাগের শাস্তি, সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শাস্তি ইত্যাদি। কিসার-এর শাস্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে- বিভিন্ন প্রকার হত্যার শাস্তি, ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে হত্যার শাস্তি, ধারালো নয় এমন উপকরণের সাহায্যে হত্যার শাস্তি, গুলি বা বোমা মেরে হত্যার শাস্তি, শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার শাস্তি, আগুনে নিক্ষেপ করে, পানিতে ডুবিয়ে, উচ্চ স্থান থেকে নিক্ষেপ করে হত্যা, মাটিতে জীবন্ত পুঁতে হত্যা করা, বন্দী করে অনাহারে হত্যা করা এসবের বদলে শাস্তি। অঙ্গহানি করা, জখম বা আহত করা, মুখমণ্ডলে আঘাত করা, অঙ্গের কর্মক্ষমতা নষ্ট করা ইত্যাদির শাস্তি সমূহ। কিসাস-এর বিকল্প দিয়াত বা রক্তপণের শাস্তি সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে তা'যীর বা সাধারণ দণ্ড বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তা'যীরের শাস্তির ক্ষেত্রেও কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে। যেমন- অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে দেয়া কিংবা ভেঙ্গে দেয়া, চেহারা কিংবা নাযুক কোন স্থানে প্রহার করা, আগুনে পুড়িয়ে বা পানিতে ডুবিয়ে শাস্তি দেয়া, ক্ষুদা-পিপাসায় কষ্ট দেয়া, ঠান্ডা-গরমে কষ্ট দেয়া, বিবস্ত্র করা, গলা টিপে ধরা, গলা মোচরানো ও চপেটাঘাত করা নিষিদ্ধ। শাস্তি সংক্রান্ত খুঁটিনাটি কোন বিষয়েই বাদ যায়নি।

বইয়ের মেকাপ গেটআপ সন্তোষজনক। প্রচ্ছদও দৃষ্টিনন্দন। মোটকথা বইটি ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে সংগ্রহে রাখার মত একটি বই। ■

"মাসিক পৃথিবী"

নিজে পড়ুন, অন্যকে

পড়তে উৎসাহিত করুন